বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৮ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭

সাহিত্য, অতিমারী ও সমাজ

বিনায়ক সেন*[১]

১। ভূমিকা

কোভিড-১৯ দেখা দেওয়ার পর থেকে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে দেশে ও বিদেশে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। এইডস্, সার্স বা ইবোলার মতো মরণ-ব্যাধি নব্বইয়ের এবং ২০০০-র দশকে দেখা দিলেও তা নিয়ে ব্যাপক তত্ত্ব-তালাশ দেখা দেয়নি– অন্তত অর্থনীতি, সমাজ, ইতিহাস ও দর্শন-চর্চায়। সাধারণ জনগণের মধ্যেও এনিয়ে উদ্বিগ্ন মনোভাব ছিল সীমিত পর্যায়ের। এর কারণ এ তিনটি ব্যাধিই অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল– বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার কোনো আশংকা দেখা দেয়নি তখন। কিন্তু কোভিড-১৯র কথা স্বতন্ত্র। ওয়ার্ল্ডোমিটারস্-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ২০ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি দেশই (২২১টি দেশে) বলা যায় কোভিড আক্রান্ত হয়েছে: এতে আক্রান্তের মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি, তার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ২৭ লাখের বেশি মানুষ। এখনো প্রতিদিন ২ লাখের বেশি মানুষ সারা বিশ্বে কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন।

কোভিড নিয়ে লেখালেখির মধ্যে তিনটি মূলধারা শনাক্ত করা যায়। প্রথম ধারায় রয়েছে মূলত অর্থনীতিবিদের লেখা, যার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ওপরে প্রভাব, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের ভূমিকা, বর্হিবাণিজ্য ও রেমিট্যান্সের ওপরে অভিঘাত, গ্রাম বনাম শহরের তুলনামূলক নাজুক পরিস্থিতি বা যাকে বলা যায় আপেক্ষিক 'ভালনারেবিলিটি', এসডিজি ও অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে বা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোভিডের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ, কোভিডের কারণে নতুন পণ্য ও সেবার 'বাজারের' আত্মপ্রকাশ, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রবণতায় কোভিডের প্রভাব, লকডাউন বা অন্যান্য কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অনলাইন বনাম অফলাইন শিক্ষাগ্রহণে ধনী ও গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈষম্য, সর্বোপরি কোভিডের কারণে কর্মচ্যুতি নারীর জীবনে কতটা 'বাড়তি বোঝার' সৃষ্টি করেছে বা তা এমনিতেই ঘরের ভেতরের কাজে ও বাইরের কাজের ভেতরে নারী-পুরুষের অসম বোঝার চাপকে কীভাবে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে– সেবিষয়ে পরিসংখ্যানসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ।

কোভিড নিয়ে দ্বিতীয় ধারার আলোচনায় রয়েছে কোভিডের কারণে পরিবারের ভেতরে নারীর প্রতি সহিংসতার সম্ভাব্য বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরে এর প্রভাব, শিক্ষার স্তর থেকে গরিব ঘরের মেয়েদের সাময়িক ছিটকে পড়ার মধ্যমেয়াদি প্রতিফল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়ে যাওয়া, কোভিডে অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে 'সামাজিক পুঁজির' সম্ভাব্য অবক্ষয় বা পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ার বিষয়। 'নারী বনাম পুরুষ', 'বৃদ্ধ বনাম তরুণ', 'কর্মচ্যুত বনাম কর্মজীবী' বা সাধারণভাবে 'গরিব বনাম মধ্যবিত্ত/উচ্চবিত্ত'– এসব সামাজিক বর্গের মধ্যে চলমান টেনশনের ভেতরে

---

* *লেখক বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক। প্রবন্ধের ওপরে অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধনের মন্তব্যের জন্য লেখক কৃতজ্ঞ।

[১] শরৎচন্দ্রের উদ্ধৃত অংশসমূহ আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'শরৎসাহিত্য' সংস্করণের প্রথম খণ্ড থেকে নেওয়া।

কোভিড কী করে নতুন সংকট ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, এমনকি নতুন ধারার মূল্যবোধের জন্ম দিয়ে চলেছে, এটি আলোচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখছেন অর্থনীতিবিদের পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরের সমাজ-বিজ্ঞানী, নারীবাদী, মানবাধিকার কর্মী, জনস্বাস্থ্য-বিশ্লেষক ও সামাজিক-পরিবেশবাদীরা।

তৃতীয় ধারার লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে সংখ্যায় ক্ষীণ কিন্তু ক্রমশ নজর-কাড়া সমাজবিদ, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদেরা, যারা মহামারী-অতিমারীর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের সূত্র খুঁজছেন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে। এরা বর্তমান মহামারীর সম্ভাব্য প্রভাবের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ বা প্রতি-তুলনা খুঁজছেন অতীতের মহামারী-অতিমারীর আর্কাইভে। এদের যুক্তি হচ্ছে যে, এধরনের অতিমারী শুধু ব্যক্তি জীবনের বা অর্থনৈতিক জীবনে নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপরিকাঠামোতেও গভীর প্রভাব রেখে যায়, যেরকমটা দেখা গেছে অতীতের মহামারী-অতিমারীর ক্ষেত্রে। উইলিয়াম ফকনারের মতো এরা বিশ্বাস করেন যে অতীত 'মৃত নয়' এবং সেই অর্থে, অতীত 'অতীতও' নয়। সেজন্যেই অতীতের অভিজ্ঞতায় তারা বারে বারে ফিরে যান, এবং সেই সূত্রে তাদের সৃষ্টি করতে হয় নতুন জ্ঞানের আর্কাইভ– সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস ও দর্শন-গ্রন্থ থেকে।

বর্তমান লেখাটি মূলত শেষোক্ত ধারার অনুবর্তী। এটি ৯টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকার পর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে থাকছে বাঙালির প্রথম কোয়ারেন্টিনের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা যেটি শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রথম এসেছিল। এটি সাম্প্রতিক সময়ে কোভিডের কারণে সৃষ্ট লকডাউনের একটি পূর্বস্মৃতি। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় জনস্বাস্থ্যের ও মহামারীর প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অতিমারীর সময়কালে মানবিক সম্পর্কের নানা দিক উন্মোচিত হয়ে ওঠে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে মহামারী প্রতিরোধে এই উপমহাদেশের 'উপনিবেশিক রাষ্ট্র' কতটুকু ও কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল তার বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। রোগ-বালাই প্রতিরোধে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল 'অতীতেই সীমাবদ্ধ' থাকেনি। এই উপনিবেশিক পর্বেই একধরনের দ্বৈত-খাত বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য-চিন্তা গড়ে উঠতে থাকে যা উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রকেও (বাংলাদেশকেও) প্রভাবিত করেছে পরোক্ষভাবে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র-চিন্তায় ও দর্শনের ওপরে মহামারী-অতিমারী প্রভাব নিয়ে কিছুটা আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। বিশেষত মিশেল ফুকোর Bio-Power ধারণার উত্থানের পেছনে মহামারী ও জনস্বাস্থ্য-কার্যক্রমের ভূমিকাকে আলাদা করে শনাক্ত করা হয়েছে। পরাধীন থাকার কারণে উপনিবেশের দেশসমূহ এই Bio-Power-র সুবিধে পায়নি বা আদায় করতে পারেনি। সপ্তম অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে মহামারী নিয়ে 'নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া' সংক্রান্ত আলোচনা। এলিয়েনেটেড উপনিবেশিক রাষ্ট্র একে তো যথাযথ জনস্বাস্থ্য-কার্যক্রম হাতে নিতে পারেনি, তদুপরি নিম্নবর্গ গোড়া থেকেই এধরনের আধুনিকায়ন বা জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিকে সন্দেহের চোখে দেখেছে এক প্রকার। এই বিচ্ছিন্নতার সদূরপ্রসারী প্রভাব এখনো দৃশ্যমান কোভিডের স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে বা টীকা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপাত-অনীহার প্রকাশে। অষ্টম অনুচ্ছেদে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে মহামারী বিশেষত অতিমারীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। মহামারী তথা স্পেনিশ ফ্লুর হাত ধরেই আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের জন্ম– এটি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নবম

অনুচ্ছেদে কয়েকটি উপসংহারমূলক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সমাজে-রাষ্ট্রে-দর্শনে মহামারী-অতিমারীর অভিঘাত সম্পর্কে।[২]

২। বাঙালির কোয়ারেন্টিন

কোয়ারেন্টিন-এর সাথে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের পরিচয় ঘটে শ্রীকান্তর হাত ধরে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে বার্মায় যাওয়ার জন্য লেখক কলকাতার জাহাজঘাটে উপস্থিত হয়েছেন। এসে দেখলেন, চোদ্দ-পনর শ' লোক 'ভেড়ার পালের মত' সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেসা করাতে জানতে পেলেন যে,'বার্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরেজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ।' 'পিলেগ্‌কা ড্‌গদরি' পরীক্ষা-পাশের পর লেখক জাহাজে তো উঠলেন, কিন্তু গোল বাঁধল রেঙ্গুনে নামার ঠিক আগে আগে। শরৎচন্দ্রের ভাষাতেই শুনি। এটা বাংলা সাহিত্যে কোয়ারেন্টিন-এর প্রথম বর্ণনা:

'পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয়, চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিকে হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসতে লাগিল, কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ার কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করিবার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোনো আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer–এর নিকট হইতে কোনো কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।'

কিন্তু দুর্ভোগের এখানেই শেষ নয়। কোয়ারেন্টিনে যেতে হয় পায়ে হেঁটে, নিজেকেই নিজের বোঝা টেনে নিয়ে যেতে হয়। শ্রীকান্তর পরিচিত ডাক্তারবাবু (যিনি তার সাথে একই জাহাজে চলছিলেন) তাকে ভৎর্সনা করেই বললেন:

'শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্র-লোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়-ততদূর বয়ে নিয়ে যেতে হয়; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছাড়িয়ে স্টিমে ফুঁটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে-মশাই এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।'

---

[২]এখানে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো রবীন্দ্র রচনাবলীর বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থিত 'ছিন্নপত্র' থেকে নেওয়া। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের যেসকল ছোটগল্পের অনুষঙ্গ বা প্রসঙ্গ এসেছে তা ঢাকার বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংগৃহীত।

বলা বাহুল্য, কোয়ারেন্টিনের সাথে বাঙালির প্রথম পরিচয় ছিল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ এক অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই বোধকরি করোনার সময় আধুনিক কালের সরকার কোয়ারেনটিন-এর বদলে লকডাউন বা 'সাধারণ ছুটির ঘোষণা' জাতীয় মৃদু শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। ভারতে মোদী তার ভাষণে লকডাউন বোঝাতে ঘরের চারদিকে 'লক্ষণরেখা' এঁকে দিয়েছিলেন। রামায়নের প্রসঙ্গ টেনে সবাইকে ঘরের বাইরে যেতে মানা করেছিলেন। এক অর্থে, সীতাই ছিলেন লকডাউনে আবদ্ধ প্রথম পৌরাণিক নারী। এবং একজন নারীকেই যে প্রথম লকডাউনে আবদ্ধ হতে হল সেটাও তাৎপর্য্যপূর্ণ বৈকি।

শ্রীকান্তর বিবরণী থেকেও এটাও স্পষ্ট হয় যে, মহামারী 'ছোটলোক' ও 'ভদ্রলোকের' মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে নিয়ে আসে না। বরং তাকে আরও প্রকট করে তোলে। করোনার সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি (শহরের) ধনী লোকের ছেলেমেয়েরা অনলাইনে কোচিং করছে, ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মে পাঠদান চলছে, কিন্তু গরিবের ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ নিতে পারছে না। কেননা, তাদের ঘরে একখানা করে মোবাইল ফোন আছে বটে, কিন্তু সেটা 'স্মার্টফোন' নয় (বাংলাদেশে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর হার মাত্র ২৫ শতাংশ; গরিবদের মধ্যে এই অনুপাত আরও কম) । অন্যান্য ইন্টারনেট প্রযুক্তি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে গ্রামাঞ্চলে। এই প্রযুক্তি না থাকায় শুধু শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, টেলিমেডিসিনও তার সম্পূর্ণ সুবিধে দিতে পারছে না। যদি হোয়াটস' আপ জাতীয় সুবিধে গরিবদের থাকত, তাহলে ডাক্তারের সাথে আরও ফলপ্রসূভাবে তথ্যের আদান-প্রদান হতে পারত, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য। করোনা জাতীয় মহামারী আয়ে-সম্পদে শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে ধনী-গরিবের মধ্যকার বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

কিছুটা হলেও শরৎচন্দ্র মহামারীর (বা মারীর) সময়ে 'ছোটজাত' ও 'উচুঁজাত' শ্রেণির মধ্যে বিপুল ফারাকের বিষয় নিয়ে ভেবেছিলেন। পুরো শ্রীকান্ত উপন্যাস জুড়েই মহামারী, মারী বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে দুর্বিপাকের কথা ছড়িয়ে আছে। এর প্রথম উপস্থাপনা শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে যেখানে লেখক ইন্দ্রনাথের সাথে রোমাঞ্চকর নৈশ-অভিযাত্রায় বেরিয়েছেন। অসম সাহসী এই কিশোরকে মহামারীর মধ্যে নির্ভয়ে রাতের অন্ধকারে কখনো ঘুরে বেড়াতে, কখনো নৌকা বাইতে দেখি। বর্ণনাটি নাটকীয়, কিন্তু তারচে' তাৎপর্যপূর্ণ চরম দুর্বিপাকেও জাতপাতের প্রশ্নের উত্থাপন। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় ফিরে যাই:

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল.....। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কিছু পচেছে, ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না-মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।"

এর পরের গল্প আমাদের জানা। ইন্দ্রনাথ সেই ছয়-সাত বছরের শিশুর মৃতদেহটিকে ডিঙিতে তুলে দূরের চরের ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে এল। তখনই এল জাত-পাতের প্রশ্ন:

> "কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম কি জাতের মড়া- তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখন্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল.....মড়ার কি জাত থাকে রে?
>
> আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা-এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক-এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না-আমগাছ, জামগাছ- বুঝলি না? এও তেমনি।"

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে সনাতন সংস্কার অনুযায়ী কোনো জাতের মানুষের মৃতদেহ, সে ছোঁয়াচে রোগে বা অন্য কিছুতে মরেছে কিনা তা না জেনে মৃতদেহের সংস্কার করা যেত না।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মহামারী অথবা গুরুতর ব্যাধি প্রবেশ করেছে। রাজলক্ষীকে যখন পাঠকদের সামনে পরিচয় করানোর উপক্রম চলছে, তখন লেখক তার বাল্যকালের সখীকে স্মরণ করছে এভাবে- 'স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষী ও রাজলক্ষী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর, সুরলক্ষীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবর ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলো তামার শলার মত- কতগুলি তাহা গুনিয়া বলা যাইত।'

অন্যের শুশ্রুষা করতে গিয়ে শ্রীকান্ত নিজেও মহামারীর কবলে পড়েছিলেন। তাকে অচেতন জ্বরে রেখে সবাই সে জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কোনো মতে পিয়ারী বাইজী তথা রাজলক্ষীর কাছে খবর পৌঁছানোতে তারই সেবাযত্নে লেখক ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেবারে প্লেগ বা কলেরা নয়, উঠে আসে আরেক মহামারীর কথা: 'সকাল বেলা শোনা গেল আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে।' অন্যত্র, লেখক স্মরণ করছেন যে এরই মধ্যে জীবনের সুখ-দুঃখগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে সাধারণ মানুষ:

> 'আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি- তা হোক তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।'

তবে গ্রাম-জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে চাননি শরৎচন্দ্র। এই দলাদলি, জাতিতে জাতিতে বিভেদবোধ, এমনকি সংকটের মুখেও একত্র না-হতে পারা এটা শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পে-উপন্যাসেই উঠে এসেছে। আর সেসবের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে মহামারী, মারী অথবা জনস্বাস্থ্যে অপ্রতিরোধ্য দুর্ভোগ। শ্রীকান্ত উপন্যাসে আমরা ইতিমধ্যেই চার চারটি মরণ-ব্যাধির উল্লেখ পাচ্ছি- প্লেগ, কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া। একদিকে মহামারীর ছায়া, অন্যদিকে জাতপাতের বিভেদ ও দলাদলি- এই দ্বিবিধ উপকরণ শরৎচন্দ্র তার নানা লেখায় ব্যবহার করেছেন। 'পল্লী সমাজ' রচনাটি এর বড় নিদর্শন।

পল্লীসমাজের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমেশ। আদর্শবাদী এই যুবক গ্রামের ভাল করতে চায়। সে জাতপাতের প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; হিন্দু ও মুসলমান সব ধর্মের গরিব কৃষককে নিয়ে গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য-বিধি পরিবর্তন করতে চায়। এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও মানুষের মধ্যে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চায়। আর এটা করতে গিয়ে সনাতনী হিন্দুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় তাকে। তাই নিয়ে তার সংঘর্ষ বাঁধে একপর্যায়ে রমা ও জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর সাথে। ম্যালেরিয়া এই কাহিনীর কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আড়ালে-আবডালে উঁকি দিয়ে গেছে:

'বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়া ভীতি বাঙ্গালার পল্লী-জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর

আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না।...তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর মাসের পর মাস এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে; কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে।...রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়।...তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল-নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনিই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। অন্তত: তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটি মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।' এক হিসেবে, পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম অঘোষিত, অস্বীকৃত কর্মী ছিল পল্লীসমাজের রমেশ।

৩। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজের রমেশ ছিলেন না, কিন্তু তিনি যখন জমিদারী কাজের জন্য পূর্ববঙ্গে যান, তখন তার বয়স রমেশরই কাছাকাছি। কালীগ্রাম, সাজাদপুর, শিলাইদহ এলাকায় ঘোরার সুবাদে বেশ কাছ থেকেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন গ্রামের জীবনযাত্রা, তার সহজ-সরল জটিল-কুটিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে। ১৮৮৯ সালে তার বয়স ছিল ২৮। রমেশের মতোই পল্লীগ্রামের উন্নতি করার নানা পরিকল্পনা জেগেছিল সেদিনের তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে, যা তিনি পরবর্তীতে নানা ধরনের গ্রাম-উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো অসফল হয়েছেন, আবার সফলতাও এসেছে এক্ষেত্রে। পল্লীগ্রামের জনস্বাস্থ্যের চরম দুর্দশা তার প্রথমেই চোখে পড়েছিল। 'ছিন্নপত্র'-এর ৬৫ নং চিঠিতে সাজাদপুরের এক স্কুলের ছাত্র-সভার বিবরণ আছে। সেখানকার এক ছাত্র অদ্ভুত ইংরেজিতে 'স্বাস্থ্যের উপকারিতা' সম্বন্ধে বলতে লাগল'। ছাত্রটি বলল 'Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill, and you cannot study or do anything.' রবীন্দ্রনাথ এরপর বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, 'বিষয়টা এমনি যে ও বিষয়ে নতুন কথা বলা ভারী শক্ত। কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে কী কষ্ট এবং সুস্থ থাকলে কী সুখ, অনুমান করি, সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিষ্কার বুঝেছ যে, আমি ও সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা না বললেও তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে চেষ্টা করবে- ইত্যাদি ইত্যাদি।' এসব কথায় জনস্বাস্থ্যের কথাটা তেমনভাবে আসেনি, কিন্তু 'ছিন্নপত্রের' পথে-পথে (বা নদীতে-নদীতে) ঘোরার অভিজ্ঞতা তার যেসব গল্পে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিধৃত হয়েছিল সেসবের মধ্যে মহামারীর কালো ছায়া স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। এসব স্বাস্থ্য-দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য খুব বেশি সরকারের মুখাপেক্ষী হতে চাননি। এর একটা কারণ হচ্ছে, সেদিনের সরকার ছিল উপনিবেশিক সরকার। জনস্বাস্থ্য বলতে এই উপনিবেশিক সরকার বুঝত বড় আকারের মহামারী

থেকে শ্বেতাঙ্গ প্রশাসক-আমলা ও সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করা। সাধারণ জনগণের সুস্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য-বিধি নিয়ে দুর্ভাবনা ছিল না উপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের। আরেকটি কারণ ছিল, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে, পল্লীস্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের ওপরে নির্ভর করেও বড় ধরেনের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। এজন্যেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে 'জলদান হইতে বিদ্যাদান'-এর জন্য সরকার-নির্ভর না হয়ে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ বা আত্মশক্তির ওপরে জোর দিতে চেয়েছেন। অন্যত্র তিনি (স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে এসে) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: 'যে সমস্ত রোগের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের ঘর করতে হচ্ছে তাদের সঙ্গে পদে পদে ঘর করতে হলে অসহায় অজ্ঞতা নিয়ে একমাত্র ডাক্তারের দিকেই তাকিয়ে থাকলে চলে না। কেননা, এদেশে রোগ যত দুর্লভ, ডাক্তার তত সুলভ নয়।' এক্ষেত্রে পল্লীসমাজের রমেশের মতোই তার মনে হয়েছিল যে, অতিরিক্ত ধন-বৈষম্য ও সামাজিক-বৈষম্যের ওপরে দাঁড়িয়ে আত্মশক্তির ধারণাকে বাস্তবায়িত করা যাবে না। পুরো উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। ১৮৯৩ সালে ছিন্নপত্রের ৮৪নং চিঠিতে তিনি বলছেন:

> "ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক, প্রশংসা করুক, যাই করুক- আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক- সেদিকে দৃকপাতমাত্র না ক'রে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাছে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্নদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি সহজ কথা।"

এবং এই সূত্রেই আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রথম বারের মতো উঠে এল সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ। রাশিয়ায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে। সেদেশে যাওয়ার ৩৭ বছর আগে (এবং রুশ বিপ্লবের ২৫ বছর আগে) রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল 'সমাজতন্ত্রের' কথা। রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে বোঝার জন্য এই 'শুরুর বিন্দুটাকে' বোঝা জরুরি। ছিন্নপত্রের ৯৫ নং চিঠিতে ১৮৯৩ সালের ১০ মে তিনি লিখলেন:

> 'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে ভারী মায়া করে- এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো-নিরুপায়-তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।...সোসাসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি না–যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দু:খ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দু:খমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই-তারা ভারী কঠিন কথা বলে।'

এখানে বৈষম্য-দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই বৈষম্য স্বাস্থ্যখাতকে ঘিরেও দানা বেঁধে উঠেছে। স্বাস্থ্যখাতের বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আজ এই করোনার কালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এর সত্যতা। ধনী লোকেরা

অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টায় 'লকডাউন' চাচ্ছে, আর গরিব লোকেরা দিন গুনছে কবে এই লকডাউন খুলে যাবে। পারলে তারা এই মুহূর্তেই লকডাউন শিথিল করতে যায়। মহামারীতে জীবন ও জীবিকার সংঘাত একটি শ্রেণি-সংঘাতে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, যারা করোনায় বেশি বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যারা তাতে মৃত্যু বরণ করছেন তাদের অধিকাংশই স্বল্পবিত্ত, অশ্বেতাঙ্গ, অভিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। করোনা-মোকাবেলার তথ্য থেকে এই প্রবণতাও বেরিয়ে এসেছে যে, সেসব দেশই এক্ষেত্রে ভাল করেছে যারা করোনার আগেই সর্বজনীন জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ও সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও চালু করতে পেরেছিল। ভারতের কেরালা রাজ্য, কিউবা, শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো (সুইডেন অবশ্য ব্যতিক্রম) সেজন্যেই ভালো করতে পেরেছে করোনার বিস্তার দ্রুত রোধ করার ক্ষেত্রে।[৩] এসব দেশে তুলনামূলকভাবে করোনাতে মৃত্যু অনেক কম হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি চেয়ে রবীন্দ্রনাথ তার 'স্বদেশী সমাজ' পর্বের বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন নানা প্রসঙ্গক্রমে। রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্কুল, পয়:নিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু সরকার বাহাদুর বা বিত্তবান শ্রেণির ওপরে নির্ভর না করে জনগণ নিজেরাই এগিয়ে আসুক অর্থাৎ এক ধরনের 'পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট' ঘটুক, এটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে অতুল সেনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি পল্লী-উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন:

> 'পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষি প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে। নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়।...[তবে] গ্রামে ওলাওঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে-আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহার খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে।' এধরনের জন-প্রচেষ্টার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। গান্ধীর স্বরাজ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ আন্দোলন থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল-এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধী এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'My Swaraj movement is the natural child of your Swadeshi movement.' আজকে এই করোনাকালের দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের 'নিজস্ব স্বাধীন উদ্যোগকে' তাই গুরুত্ব দেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। দল-মত নির্বিশেষে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরী ত্রাণ ও স্বাস্থ্য কমিটি এবং নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু সরকারী দল, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং কর্পোরেট প্রাইভেট সেক্টরের ওপরে নির্ভর করে করোনা পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।[৪] এই পদ্মাপারের পতিসরেই ১৮৯৪ সালে

---

[৩]কেরালায় অতি সম্প্রতি অবশ্য করোনা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। যেসব দেশ প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপরে বেশি নির্ভরশীল, তাদের ক্ষেত্রে করোনার 'দ্বিতীয় ঢেউ'-এর ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অধিক। কেরালা রাজ্য ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রবাসী রেমিট্যান্স নির্ভর অঞ্চল।

[৪]এই উপলব্ধিটি আবার নতুন করে ফিরে এসেছে করোনার কালে। জনগণকে করোনার স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে না পারলে এর দীর্ঘমেয়াদি উপদ্রব সমাজে থেকেই যাবে-এ বিষয়টি জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও গণমাধ্যমে। করোনার লকডাউনের শুরুর দিকে কর্মচ্যুত শ্রমিক পরিবারকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে রক্ষা করার জন্য অপেক্ষাকৃত

(অর্থাৎ ছিন্নপত্রের পর্বেই) লিখিত হয় তার বিখ্যাত 'এবার ফেরাও মোরে' কবিতা, যেখানে তিনি জনস্বাস্থ্যের কথা বলবেন বড় করে:

'বড়ো দু:খ, বড়ো ব্যথা-সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূণ্য,বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

১৯২৬ সালে ময়মনসিংহে এসে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি 'ত্যাগের ভিক্ষা' চেয়েছিলেন তার স্বদেশবাসীর কাছে। তার বক্তব্য ছিল এরকম:

"কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে? কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী? সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদী-স্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে।...প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো-তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে।"

এতো গেল রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে-প্রবন্ধে জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ। মহামারীর পদধ্বনি বেশি করে শোনা যায় তার 'গল্পগুচ্ছে'। সেখানে গল্পের পর গল্পে পাত্র-পাত্রীরা মারী, মহামারী বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কয়েকটি উদাহরণ।

৪। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে ও উপন্যাসে মহামারী

পোস্টমাষ্টার গল্পের রতনকে পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়ই। সেই পোস্টমাস্টার যার প্রথম দেখা মিলেছিল 'ছিন্নপত্রে'। এর ১৭ নং পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এখানকার পোস্ট্মাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি-যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠি-বাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্ আপিস...পোস্ট-মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীরভাবে বলে যায়।' এ চিঠি লেখা হচ্ছে ১৮৯১ সালে। পোস্টমাস্টার গল্পটিও সমসাময়িক পর্বের রচনা। রতনের কাজ ছিল পোস্টমাস্টারের ঘরের কাজ-কর্ম সামলানো। নির্জন বিভূঁইয়ে এসে শহরের সন্তান তরুণ পোস্টমাস্টার যেন হাঁস-ফাঁস করছিলেন। রতনের বয়স বারো-তেরো, সেসময়ের হিসেবে সে বিবাহযোগ্যা। কিন্তু লেখক জানিয়েছেন যে সে ছিল 'পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা', আর তার 'বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।' বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও উলাপুর গ্রামের নির্জন পরিবেশে দু'জনের মধ্যে এক অদ্ভুত মায়াময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:'এক-

---

বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। তাতে করে কতটা সাড়া মিলেছিল সেটা তলিয়ে দেখার বিষয়।

একদিন সন্ধ্যে বেলায়... পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন–ছোটো ভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা।' যে-কথা বাইরের কাউকে বলা যেত না, সেকথা তিনি 'একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না।' বালিকাটিও কথোপকথনকালে পোস্টমাস্টারের ঘরের লোকদের 'মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতদের ন্যায় উল্লেখ করিত।' সেই পোস্টমাস্টার একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেশ ভালো জ্বর আসল তার গায়ে। অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে রতনকেই সেবা-শুশ্রুষার ভার নিতে হল। সেই জ্বর সাধারণ জ্বর নয়। অনেক দিন ধরে চলেছিল এই সেবাকার্য। লেখক জানিয়েছেন, 'বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন', এবং 'মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে।' কর্তৃপক্ষকে যে-চিঠি লিখলেন তাতে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন 'স্থানীয় অস্বাস্থ্যের কথা'। লেখকের বিবরণ শুনে ধারণা হয় যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কবলেই তখন পড়েছিলেন পোস্টমাস্টার: 'এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ' হয় নাই। বালিকা রতন 'আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথা সময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?" তারপরে স্থানীয় মারী-মহামারীর ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে আমাদের শহরের আধমরা 'ভদ্রসন্তান' কীকরে সমস্ত মায়া-দায়িত্ব ছিন্ন করে রতনকে পল্লীগ্রামের অন্ধকারে রেখে নতুন কর্মক্ষেত্রে চলে গেলেন, সেকথা সকলেরই জানা।

ব্যাধির কালো প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত ছোটগল্পের নেপথ্যে কাজ করেছে। 'ছুটি' গল্পে ফটিক হঠাৎ করে জ্বরে পড়ল। সেই জ্বর এমনই তা ক্রমেই বেড়ে চলল। ডাক্তার এসে বললেন, 'অবস্থা বড়ই খারাপ।' এভাবেই একপর্যায়ে ফটিক অনন্ত ছুটির অবকাশে চলে গেল। 'সম্পাদক' গল্পে মূল চরিত্রটি লেখক। নিজের লেখালেখি নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন মা-মরা একমাত্র মেয়েটির প্রতি তাকানোরও ফুরসুৎ ছিল না তার। মেয়েটির নাম প্রভা, সে বাবার অযত্নে মানুষ। একবার লেখার সময় প্রভা স্নান-করার কথা বলাতে লেখক হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, 'এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে।' সেই থেকে প্রভা নিজের খেলার জগতেই থাকে। গল্পের শেষটায় আমরা প্রভাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখি:

> 'বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদস্বরে ডাকিয়াছিল, "বাবা।"...কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন-ঈষৎ নির্মীলিত, দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে। মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পড়িতেছে, কপালের শির দপ্ দপ্ করিতেছে।...পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।'

'মধ্যবর্তিনী' গল্পেও হরসুন্দরীর জ্বর হয়েছে, কিন্তু এবারে স্পষ্ট যে ম্যালেরিয়াই হয়েছে তার। 'জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয় বাধাগ্রস্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।' হরসুন্দরী একপর্যায়ে ভালো হল বটে, কিন্তু তার যৌবনের সৌন্দর্যদীপ এই রোগের আক্রমণে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। সন্তান

ধারণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিল। দ্বিতীয় বার বিয়ে করল তার স্বামী নিবারণ। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী শৈলবালাও মারা গেল–অবশ্য মহামারীতে নয়, গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতায়।

অন্যত্র, 'দৃষ্টিদান' গল্পে দৃষ্টিহারা কুমু শুনেছে যে তার ডাক্তার স্বামীর কাছে এক 'বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাওঠার চিকিৎসার জন্য' এসেছেন। আরেকটি বিখ্যাত গল্প 'মাল্যদান'- এও সরাসরি প্লেগের প্রসঙ্গ টেনেছেন রবীন্দ্রনাথ:

> 'যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিনী আসিয়াছে। পুলিশ তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে। যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত।' মেয়েটিকে যতীন চিনেছিল–তাকে 'কুড়ানি' নামেই চিনত। সে ছিল তার খুড়তত বোন পটলের বন্ধু। 'কুড়ানি' নামের কারণ দুর্ভিক্ষের সময় তার বাবা-মা মারা যায়, মেয়েটিকে 'কুড়িয়ে এনে' প্রতিপালন করছিল পটলদের পরিবার। মাল্যদান যে-সময়ে লেখা সেসময়ে কোলকাতা শহরে প্লেগের আক্রমণ হচ্ছিল মাঝে মাঝেই। লেখক জানিয়েছেন যে, 'পটলের স্বামী হরকুমার বাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট...প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন।' যাহোক, অসুস্থ কুড়ানিকে বহুদিন পর হাসপাতালের বেডে দেখে অবাক হয়েছিল যতীন। তার মনে হল, 'এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়।' শেষ পর্যন্ত 'কুড়ানিকে' বাঁচানো যায়নি প্লেগ থেকে, যদিও মৃত্যুর আগে যতীনের সাথে তার মালাবদল ঘটেছিল।

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর শক্ত অসুখ করেছিল। তারপরও সে বাপের বাড়ী যেতে পারেনি। তার বাবাকে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কথোপকথনটি এরকম:

> 'বউমার শরীর ভাল নাই! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ। শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।" আমার শ্বশুর কহিলেন, " জানেন না তো উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উঁহার কথাটি কি–"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।"

'ভাইফোটা' গল্পটিতে মারণাত্মক ব্যাধির প্রসঙ্গ এসেছে। বাল্যকালের বন্ধু অনুসূয়ার সম্পর্কের সূত্র ধরে। ন্যারেটরের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার আগেই অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় অনুসূয়ার। কিছুদিন পরে

লেখক শুনতে পেলেন যে 'অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা' হয়েছে। অনুর স্বামী মরবার আগে কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। ব্যবসায় পুঁজির আশায় লেখক যান অনুসূয়ার সাথে দেখা করতে। বিবরণীটি এরকম:

> 'স্বামীর সঙ্গে মফ:স্বলে ফিরিবার সময় বার বার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে, তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াচে।...আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।'

'শেষের রাত্রি' দিয়ে গল্পগুচ্ছে ব্যাধি ও মহামারীর প্রসঙ্গ শেষ করি। গল্পের নায়ক যতীন রোগশয্যায়, সে আশা করে আছে তার অল্প-বয়সী বউ মনি তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। কিন্তু মনি যেতে যাচ্ছে তার বাপের বাড়িতে–তার ছোট বোনকে দেখতে। ফলে যতীনকে দেখার জন্যে একমাত্র ভরসা কেবল তার মাসি। কিন্তু মাসি যতীনকে কষ্ট না দেওয়ার জন্যে বলেছেন যে খাবার-দাবার সব রান্না করছে আসলে বউই। কেবল সে কাছে আসছে না তার কারণ ঘর-কন্নার অনেক কাজ তাকে একা একা সামলাতে হচ্ছে। যতীনের ঠিক কী রোগ হয়েছে লেখক তা আমাদের জানাননি। কিন্তু রোগটি যে ভয়ানক এতে সন্দেহ থাকে না নানাবিধ খণ্ড সংলাপের মধ্য দিয়ে।

> "মাসি!"
>
> "ঘুমোও যতীন, রাত হল যে।"
>
> "হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই।"

অথবা, " শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই কেন।"

অথবা, 'জানালা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।' গল্পের শেষে যতীনের মৃত্যু হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে, তবে তার আগে তার বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে এক পলক দেখার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ছাড়াও ১৯১৬ সালে লেখা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে মহামারীর উল্লেখ রয়েছে।[৫] শচীশের কাকা কলকাতার প্লেগের সময় রোগীদের চিকিৎসার্থে তাদের বাড়িটিকে আরোগ্য-নিকেতন করে গড়ে তুলেছিলেন। রোগীদের সেবা দিতে গিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতায় প্লেগের প্রসঙ্গ ১৮৯০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখাতেই এসেছিল। এসময়ই পদ্মা বোট থেকে তিনি

---

[৫]'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে প্লেগের প্রসঙ্গ ও প্রতিবেশীর বিপদে (বা, বৃহত্তর অর্থে, মানুষমাত্রেরই বিপদে-আপদে) সমাজ বা ব্যক্তির এগিয়ে আসার 'পলিসি ইম্পর্টেন্স' লঘু করে দেখার নয়। মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ (Responsibility) কেবল মাত্র আইন করে বা বিধান/ প্রবিধান করে জাগ্রত করা যায় না। এপ্রসঙ্গে নৈতিকতা-বোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন সম্প্রতি কালে অমর্ত্য সেন ও মাইকেল স্যান্ডেল (দেখুন, Sen 2009; Sandel 2009)। ২০২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক 'ওয়েবিনারে' অমর্ত্য সেন Responsibility-র প্রসঙ্গে সাহিত্যের উদাহরণ সহকারে তুলে ধরেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন, 'কলকাতায় প্লেগ ত খুব জেগে উঠচে। আপনার বুঝি স্থানত্যাগ করতে সম্মত নন্?'

এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার কথাও উল্লেখ করা যায়। বিবেকানন্দের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মিস মার্গারেট নোবল আয়ারল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন। বিবেকানন্দর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন। বিবেকানন্দ ওর নাম দেন 'নিবেদিতা'। নিবেদিতা যখন ১৮৯৮ সালে কলকাতায় পা রাখলেন, তখন চতুর্দিকে প্লেগের পদধ্বনি। ১৮৯৯ সালে বোম্বাই শহরে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে দাঙ্গাও হয়। কলকাতা তথা বঙ্গদেশেও এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। 'নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ: এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন' বইতে দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন যে, 'পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষে অমানুষিক সেবাকাজ চালিয়ে কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা ম্যালেরিয়া ও "ব্রেন ফিভারে" [সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া অথবা এন্‌কেফেলাইটিস] শয্যাশায়ী।' সেসময় মানে ১৯০৬ সাল। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অবলা বসুকে লিখেছিলেন- 'নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না – আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েকদিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে, উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্য প্রত্যাশায় রহিলাম।' নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যকার সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ। সুহৃদ জগদীশচন্দ্রের মাধ্যমে নিবেদিতার সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবোটে অতিথি হয়েও গিয়েছিলেন তিনি, পূর্ববঙ্গের কৃষকদের অন্ত:পুরে গিয়ে আপনজনের মতো করে গ্রামের মা-বোনদের সাথে কথা বলেছেন। গেছেন অনেকবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও। এই যাওয়ার পেছনে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের পরিবারকূলের একাংশকে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সংঘ-কার্যক্রমে "দলে ভেড়ানোর" ইচ্ছেও তার থাকা অসম্ভব ছিল না। সরলা দেবীকে তো প্রায় দলে টেনেই নিয়েছিলেন। এনিয়েও রবীন্দ্রনাথের সাথে মনোমালিন্য হতে পারে তার। তার ছোট মেয়েকে (মীরা?) ইংরেজি শেখানোর জন্য অনুরোধ নিবেদিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন – সেটাও একটা কারণ হতে পারে। নিবেদিতার প্রত্যাখান ছিল তীক্ষ্ম, এমনকি রূঢ়:' সে কি! ঠাকুর বংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকি বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে!' শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য-বিমুগ্ধতার প্রতি কটাক্ষ করে আইরিশ নিবেদিতা বললেন: "ঠাকুরবাড়ীর ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?" এই অসংকোচে মত রাখার প্রবণতা নিবেদিতার মধ্যে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাথে জাগতিক আধ্যাত্মিক মত ও পথ নিয়ে মাঝেমাঝেই তুমুল তর্ক বেঁধে যেত। তার সবটুকু আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু জেনেছি যে (সাহিত্যিক বনফুলের স্মৃতিচারণার সুবাদে), "গোরা" উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স বদলে দিতে নিবেদিতাই পীড়াপিড়ি করেছিলেন, এবং এর ফলে উপন্যাসের বিয়োগান্ত পরিণতি একটি ইতিবাচক সমাপ্তিতে শেষ হয়। বনফুল লিখেছেন:

"[গোরার] শেষটা বদল দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। নিবেদিতা নাছোড় হয়ে ধরে বসল। আবার ঢেলে সাজালাম সব।"

"গোরার শেষটা অন্যরকম ছিল?"

"হ্যাঁ। আমি গল্পটা বিয়োগান্ত করেছিলাম।...গল্পটা ধারাবহিক ভাবে প্রবাসীতে বেরুচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল–গোরার শেষটা কি রকম করেছেন দেখি।

দেখালাম। পড়েই সে বলে উঠল – না না, এ রকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না কাব্যের জগতেও কবি সেটা ঘটিয়ে দেবেন না? কাব্যের ও জগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে। এমন জেদ করতে লাগলে যে রাজি হতে হল। সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।" গোরা উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স বদলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা আর কারো জন্য তিনি কখনো করেননি। এর একটি কারণ হতে পারে, দেশব্রতী গোরার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন নিবেদিতারই কাছ থেকে। শিল্পী নন্দলাল বসু স্মৃতিচারণা করেছেন পদ্মায় বোটে করে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার আলাপচারীতা সম্পর্কে: 'তাহাদের আলোচনার বিষয় আমি কিছু জানি না। তবে শুনেছি, "গোরা" উপন্যাসের hero গোরা সিস্টারকে মনে করে করেছিলেন।' আমার ধারণা, নিবেদিতার আদর্শ-রূপ তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৮৯৮ সালে কলকাতার প্লেগের সময়ে। ভয়-ভ্রুক্ষেপহীনভাবে নিবেদিতা তখন প্রকৃতই আর্তের 'ভগিনী' হয়ে প্লেগের মতো মহামারীর কালে বিপন্নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার সেই তেজদৃপ্ত মূর্তি, উজ্জল গৌরবর্ণ, এবং সন্ন্যাসিনীর মতো ত্যাগী পথ-চলা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না।[৬]

প্লেগের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে সেসময়ই। এর আগে প্লেগ সম্পর্কে শুনেছেন, কিন্তু অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা, ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করা, আর্তজনের পাশে দাঁড়ানো তার এই প্রথম, এবং তা সিস্টার নিবেদিতার সাথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। এ সম্পর্কে প্রথমে শুনব এডওয়ার্ড টমসনের (বিখ্যাত ইংরেজ বামপন্থী দার্শনিক ই পি টমসনের পিতা) ভাষ্যে। টমসন লিখেছেন: 'That year [1898] plague broke out in Calcutta; she [Sister Nivedita] organized relief work, assisted by Tagore' (Thompson 1979)। দ্বিতীয় উৎস শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণা: 'সেইসময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবি কাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবি কাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেকশনে যেতেন।' পরের বছরে, অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে প্লেগ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল কলকাতায়। প্লেগের টীকা দিতে জনগণের একাংশের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ছিল। যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না, সেখানে বিদেশী শাসকের টীকা নিয়ে শেষটায় 'জাত খোয়াতে হবে নাকি', এই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। 'Calcutta Notes by an English Lady' শীর্ষক রচনায় নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন যে, কয়েকটি পরিবার, বিশেষত ঠাকুর পরিবার দৃঢ়তার সহিত এই বিক্ষোভ প্রশমন করিতে চাহিয়াছেন'। ১৯০৯-এ গোরা প্রকাশের দু'বছরের মাথাতেই নিবেদিতার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির চমকপ্রদ অনুবাদ নিবেদিতারই করা (তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়)। তিনিই রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম অনুবাদিকা। একাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু–রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার দুজনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার নাম দিয়েছিলেন–লোকমাতা।

আমি বলতে চাইছি যে, মহামারীর ছায়ার ভেতরেই রচিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো, গোরা বা চতুরঙ্গের মতো উপন্যাস। মহামারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় তার 'আত্মশক্তির'

[৬] এবিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত (২০০৮)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনফুল-প্রসঙ্গে, নন্দলাল বসুর উল্লেখ করা হয়েছে দেবাঞ্জন সেনগুপ্তর লেখার সূত্রেই।

প্রবন্ধমালায় (স্বদেশী সমাজ, লোকহিত প্রভৃতি প্রবন্ধে), এমনকি তার এই সময়কার দেশাত্মবোধক গানের বিচ্ছিন্ন চরণে। রোগক্লিষ্ট আর্ত মানবতার বেদনাকে অনন্ত শক্তির বোধে রূপান্তরের জন্যই রচিত হয় তার নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতা ও সংগীত। মারী ও মহামারী তার সৃষ্টিশীলতাকে মানবতাবাদের দিকে প্রভাবিত করেছে।

এই মানবতাবাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জগমোহন চরিত্র। তিনি আস্তিক বা নাস্তিক সে পরিচয় গৌণ। তার পরিচয় তিনি প্লেগের দু:সময়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের জীবনের তোয়াক্কা করেননি। এক অর্থে, নাস্তিক জগমোহন আস্তিক নিবেদিতার কাউন্টার-পয়েন্ট। সেই ১৮৯৮ সালে– যে বছরে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল – নিবেদিতাও রাস্তায় নেমেছিলেন, জগমোহনও রাস্তায় নেমেছিলেন। নিবেদিতা বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু জগমোহন মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর বিবরণটা এই:

> 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোক ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি–
>
> জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?
>
> কাদের?
>
> ঐ-যে চামারদের।'

একথা শুনে হরিমোহন তার ছেলে শচীশকে বললেন তার সাথে গঙ্গার ধারের বাড়িতে চলে যেতে। কিন্তু শচীশ তার কাকার প্রভাবে বলল যে তার এখানে কাজ আছে– হয়ত প্লেগের রোগীদের যত্ন নিতে হতে পারে। শুনে হরিমোহন বললেন, 'তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে' নরকে পাঠাতেও পার। এই বলে পাজি নচ্ছার নাস্তিক বলে গালাগালি করতে লাগলেন পুত্রকে। আর নিজে বাসায় ফিরে 'খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক কালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।' এদিকে পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল এবং পাছে হাসপাতালে ধরে নিয়ে যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকতে চাইল না (অনেকটা আজকের দিনে কোয়ারেন্টিনে যদি নিয়ে যায় করোনা ধরা পড়লে, সেই ভয়ে যেভাবে অনেক মানুষ ডাক্তার দেখানোর সময় তার অসুখ চেপে রাখে, ঠিক তেমনই)। কিন্তু জগমোহন ভাবলেন, 'ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।' সেজন্য তিনি নিজেই 'নিজের বাড়িতে হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন। আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না।'

উপরের বিবরণী এবং জগমোহন-অধ্যায় থেকে পাঠকদের মধ্যে সন্ধ্যাকাশের একটি-দুটি-তিনটি তারা ফোটার মতো কয়েকটি প্রশ্ন বোধকরি ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে। সেগুলো একে একে সামনে আনা যাক। একটি হচ্ছে, ডস্টয়েভস্কি যেটা বলেছিলেন, Prisons tell who we are–সেটা সম্ভবত মহামারী বা অতিমারীর জন্যও প্রযোজ্য। বিপদে পড়লে যেমন বন্ধুর আসল চেহারা দেখা যায়, আমরা

আসলে কী তা মারী বা মহামারী আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। অবিশ্বাসী জগমোহন আর্তের সেবার জন্য প্লেগের কলকাতায় থেকে গেলেন এবং নিজের বাড়িতে হাসপাতাল খুলে ফেললেন। আর ওদিকে দুর্গানাম জপ করতে করতে বিশ্বাসী হরিমোহন কলকাতা ছেড়ে পালালেন। জগমোহন বা তার ডাক্তার যে-কাজটি করেছিলেন, তা কোনো Rights-based ডিসকোর্স দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সরকারি হাসপাতালের ভেতরে যা-ও বা দশটা-পাঁচটা কাজ করার একটা বিধি-নির্দিষ্ট প্রথা থাকে যার অধীনে ডাক্তাররা সেবাদানের কিছু অধিকার পেয়ে থাকেন ও কিছু দায়িত্ব নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু জগমোহনের হাসপাতাল ছিল তার বাড়িতে। তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা কোনো আইনি বা সরকারি বিধিবিধান থেকে আসেনি। এটা নিতান্তই নৈতিক পরার্থপরতাবোধ থেকে উদ্ভূত: এই দায়িত্ববোধ আর সরকারি বা সরকার-স্বীকৃত/নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি হাসপাতালের নিত্যদিনের কাজ থেকে বাস্তবিকই আলাদা। রতন পোস্টমাস্টারের যে সেবা করেছিল প্রবল জ্বর থেকে ভালো করার জন্য, তা তার প্রতিদিনের সুনির্দ্দিষ্ট কাজকর্ম তথা ঘরবাড়ি দেখাশোনা, মোছামুছি, হেঁশেলে গিয়ে প্রয়োজন মতো রুটি সেঁকে আনা এসব থেকে একেবারেই আলাদা। প্রাত্যহিক Chores পালন করার জন্য রতন হয়ত পারিশ্রমিক পায় (আশ্রয় ও খাবার পায়)–সেটা 'কন্ট্রাক্টের' অংশ-জ্বরে-পড়লে সারা রাত জেগে সেবাদান করা সেই কন্ট্রাক্টের অংশ নয়। সেটি হচ্ছে কন্ট্রাক্টের বা আইনি অধিকারের বাইরের 'মানবিক দায়িত্ববোধ'। এর গুরুত্ব এখানেই যে, 'মানবিক অধিকার' পালন করা ছাড়া কোনো বড় ধরনের সংকট – কোনো প্লেগ বা করোনা জাতীয় মহামারীর সংকট–থেকেই উত্তরণ সম্ভব নয়। কোনো পেশাগত নিয়মনীতি বা সার্ভিস রুলের প্রসঙ্গ টেনে কোনো ডাক্তার বা নার্সকে মহামারী মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করা যায়নি এবং এখনো যাবে না। সেটা আসে আইনি অধিকার বা বিধিমালার অতিরিক্ত এক বাড়তি মানবিক তাগিদ থেকে। এজন্যেই অমর্ত্য সেন Responsibility-কে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন––একে legal-juridical ডিসকোর্সের অধীনস্ত করে কেবল দেখতে চাননি।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি চলে আসে তা হলো –– এত যে মহামারী হচ্ছিল উনিশ-বিশ শতকে, উপনিবেশিক রাষ্ট্র কেন এব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়নি? রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে রাষ্ট্রকে তৎপর হতে হবে – এরকম স্বাভাবিক প্রত্যাশা উপনিবেশিক সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? সেইসাথে তৃতীয় প্রশ্নটিও মনে না জেগে পারে না। মহামারী প্রতিরোধে উপনিবেশিক রাষ্ট্র যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল, তাতে করে সময় সময় জনঅসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল কেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটি –– মহামারী সম্পর্কে উপনিবেশিক ও আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া –– 'পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজ' পাঠক্রমের অংশ। আর তৃতীয় প্রশ্নটি 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বা সাব-অলটার্ন স্টাডিজ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এক বহুল অধীত বিষয়।

৫। মহামারী প্রতিরোধ: উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা

উপরের সবগুলো প্রশ্নের এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু দ্বিতীয় প্রশ্নটির কয়েকটি দিকের প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।[৭] প্রথমত, উপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য 'জনস্বাস্থ্যের' বিষয়টি ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত। বাণিজ্য করতে এসে বঙ্গদেশে তিনটি গ্রাম নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন তার কাজকর্ম শুরু করে তখনও 'জনস্বাস্থ্য' তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি।

[৭] এই অধ্যায়ের আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে মূলত দীপেশ চক্রবর্তীর ক্লাসিক রচনা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মহামারী ও এর প্রভাবাধীন জনসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা থেকে (দেখুন, দীপেশ চক্রবর্তী ২০১১)।

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে হারানোর পর বাংলায় (এবং বাংলাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য প্রদেশে) অবাধ উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ আসল কোম্পানির সামনে প্রথম বারের মতো। আরও বেশি বেশি করে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। কোম্পানি শাসনের অংশ হিসেবে দাঁড় করাতে হলো এক নতুন আমলাতন্ত্রের। এজন্য অনেক শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী বিলেত থেকে এলেন; তাছাড়া ভাগ্যন্বেষী ইংরেজরা তো ছিলেনই যারা নতুন উপনিবেশে এসে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই উপনিবেশিক কর্মযজ্ঞের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এদেশের আলো-হাওয়া। ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী তার 'শরীর, সম্পদ ও রাষ্ট্র: উপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জন সংস্কৃতি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, জনস্বাস্থ্যর মূল নিহিত ছিল 'একটি নিতান্তই সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনীতিক প্রশ্নে: শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশ গড়তে পারবেন?' এই প্রয়োজন মেটাতেই ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত হয় জে. লিন্ড রচিত বই– "এসে অন ডিজিজেস ইন্সিডেন্ট অফ ইউরোপিয়ানস ইন হট ক্লাইমেটস।" এর কয়েক বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেডিক্যাল সার্ভিস চালু হয় ১৭৬৪ সালে। সেসময়কার 'রুলিং আইডিয়া' ছিল–গরম দেশগুলোর আবহওয়া শ্বেতাঙ্গ মানুষদের জন্য আখেরে অস্বাস্থ্যকর, ফলে সেখানে তাদের দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব চালানো কঠিন। এই থিওরীর ভিত্তি ছিল — 'মায়াস্মা' বা পূতিবাষ্প তত্ত্ব। মায়াস্মা বা অশুভ হাওয়া-তত্ত্বের জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপে, যখন 'কালো মৃত্যু' (Black Death)-এর করালগ্রাসে ইউরোপের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৩৪৬-৪৮ সালের মধ্যে মাত্র তিন বছরে প্লেগের কারণে এই মৃত্যু ঘটে। এর আগেও প্লেগ এসেছিল ইউরোপে, কিন্তু সেবার চীন থেকে প্লেগের যে স্ট্রেইনটি আসে তা লন্ডভন্ড করে দেয় ইউরোপের সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতির সবকিছু। সেসময়ের বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার মান আজকের মতো ছিল না। সেজন্যেই অশুভ হাওয়া-তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বের মূল কথা ছিল, প্লেগ ও কলেরার মতো রোগগুলি পচনশীল দেহ (মানুষ বা প্রাণী) থেকে বাতাসে ছড়ায় এবং একবার সেই 'খারাপ বাতাস' গায়ে লাগলে মানুষ তাতে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। ১৮৬০ সালে যখন 'জীবাণু-তত্ত্ব' আবিষ্কৃত হলো তখন জন্ম হলো এক নতুন শাস্ত্রের, যার নাম ট্রপিক্যাল মেডিসিন। পচনশীল শরীর এবং হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো এই শরীর-নির্গত অশুভ বাষ্পকণার বিপরীতে পরবর্তীকালে এসেছিল জীবাণু-তত্ত্ব অর্থাৎ প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রতিটি রোগের পেছনে রয়েছে বিশেষ বিশেষ জীবাণুর ক্রিয়াশীলতা। প্রতিটি মারী, মহামারী বা গুরুতর ব্যাধির মূলে আসলে কাজ করছে ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল–অন্তত স্বাস্থ্যগত দিক থেকে। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের জনক প্যাট্রিক ম্যানসন ১৮৯৮ সালে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি এখন স্থির নিশ্চিত যে, শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনা করা সম্ভব।' কিন্তু একথা তো বলা হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধ-জয়ের প্রায় দেড়শো বছর পরে। ১৮শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এবং প্রায় পুরো উনিশ শতক জুড়ে তাহলে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নটিকে সামাল দেওয়া হয়েছিল কী করে? নাকি জনস্বাস্থ্য বলতে সেরকম কিছু ছিলই না তখন?

সমসাময়িক নানা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, কোম্পানির সৈন্যদের মহামারী থেকে রক্ষা করাই ছিল জনস্বাস্থ্যের মূল মনোযোগের বিষয়। ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতে ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসারদের মধ্যে মৃত্যুর ৯৪ শতাংশই ছিল নানাবিধ অসুখের কারণে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বর, কলেরা, রক্ত-আমাশা, উদরাময় প্রভৃতি অসুখ। এসব অসুখ থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল উপনিবেশের প্রজাদের বাসস্থানের পরিবেশের উন্নতি ও উন্নত স্বাস্থ্যবিধির প্রবর্তন (যথা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পয়:নিষ্কাশন, যেখানে সেখানে থুতু-কফ না ফেলা, স্যানিটেশন, হাত ধোওয়ার অভ্যাস

ইত্যাদি)। এটা হলে কিছুদিন পরপর সংক্রামক মারীর আশংকা অনেকখানি লুপ্ত হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিবেশিক সরকারের পক্ষে এ-দায়িত্ব পালন করা কঠিন। তার উদ্দেশ্য এখানে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' প্রতিষ্ঠা নয়, বরং অশুভ হাওয়া-তত্ত্ব মেনে কী করে শোষণের মাত্রা আরও তীব্র করে সম্পদ-পাচার দ্রুত গতিতে নিষ্পন্ন করা যায় সেলক্ষ্যে কাজ করা। আইনের প্রয়োগের সূত্রে বলা হলেও এর বৃহত্তর তাৎপর্য রয়ে গেছে। উনিশ শতকের মানদণ্ড অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের যেসব রীতি ইংল্যান্ডে প্রয়োগ করা হয়েছে, পরাধীন ভারতবর্ষে তা একেবারেই অনুসৃত হয়নি। আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হয়নি। পার্থ চ্যাটার্জী একেই বলেছিলেন– 'কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স' (Chatterjee 1993)। সারা উনিশ শতক জুড়েই বাংলাদেশের গ্রাম ছিল একটি উপেক্ষিত বিষয়, বিশেষত জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২/ ২০১০ক) গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশে রাষ্ট্রের ওপরে নির্ভর না করে 'পরিবারকে সক্রিয় করতে চাওয়া হয়েছে এই কারণেই। মমার্থ এই যে, উপনিবেশিক রাজশক্তির কাছে জনস্বাস্থ্য-রক্ষার কর্মসূচি প্রত্যাশা করে লাভ নেই। ভারতবাসীকে বাঁচাতে হলে পারিবারিক পর্যায়েই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, নতুবা কলেরা-বসন্তে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ভূদেবের গ্রন্থের পঞ্চদশ প্রবন্ধের শিরোনাম 'পরিচ্ছন্নতা'। সেখানে বিবরণটি এইরকম:

> 'দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদয় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিস্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সন্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দিষ্ট। বিশেষত: গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সচল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যেভাবে রাখ, আজকের সকল ঘর সেইভাবে রাখিলেই হইল। বস্তুত: শুচিতাপ্রিয় য়িহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহে এবং গৃহোপকরণ সমস্ত অতি সুপরিস্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্মশাস্ত্রে আদেশ আছে, এবং য়িহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ সমস্ত ভক্তি পূর্বক প্রতিপালন করে।'

তবে ভূদেব এটাও লক্ষ করেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় উন্নতি ঘটানো একান্তভাবেই কঠিন। 'পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়–– উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; লক্ষীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক ঘটিয়া উঠে না।' অবশ্য যদি রাষ্ট্রতরফে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনা কার্যক্রম পরিচালিত হত বা আধুনিক যুগের ন্যায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, আবর্জনা পয়:নিষ্কাশন প্রণালী, সুপেয় ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হত, তাহলে গরিবরাও পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রমে সমান তালে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু উপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এটা আশা করা সম্ভব ছিল না।

১৯১২ সালে এদেশে প্রাদেশিক পর্যায়ে সর্বপ্রথম পাবলিক হেলথ্ ডাইরক্টেরেট-এর প্রতিষ্ঠা হয়। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ জাতীয় মহামারীতে অনেক সেনা সদস্যের মৃত্যু এই প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে। অবশ্য এতে করে জনগণের স্বাস্থ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসেনি। এদেশের জনসাধারণকে

মারী বা মহামারী মোকাবেলায় মূলত নিজের চেষ্টার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট 'স্বাস্থ্যবিধি' লিখে প্রচার করেনি। তাই ভূদেবের মতো প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতকে 'রোগীর সেবা' করার বিধান লিখতে হয়েছে। মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে ভূদেবকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হয়েছে:

> 'গৃহস্বামী সকলকে সর্তক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে–তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটি হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিস্কৃত হয় –– তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে –– এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে ... ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের ...ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আইসেন।' এ যেন হাল আমলের করোনার কালের 'হোম কোয়ারেন্টাইনের' বিধিমালা তৈরি করছেন ভূদেব মুখ্যোপাধ্যায়।

তবে উপনিবেশিক রাষ্ট্র একেবারেই এদেশীয় জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিরুত্তাপ ছিল তা নয়। রাষ্ট্রের নিস্পৃহ হওয়ার উপায় ছিল না যখন কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বড় আকারের সমাবেশ করার আশংকা তৈরি করত। বিশেষত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই সচেতনতা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। যেসব স্থানে প্রচুর জনসমাবেশ হত, উপনিবেশিক সরকার সেসব স্থানের ওপরে কড়া নজরদারী রাখতেন। সাব-অলটার্ন হিস্টোরিয়ান ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ সরকার হরিদ্বারের কুম্ভমেলা, এলাহাবাদের প্রয়োগের মেলা, পুরীর জগন্নাথধাম, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, তামিলদেশের কাঞ্চিপুরম, মহারাষ্ট্রের নাসিক প্রভৃতি ধর্মীয় মেলা ও তীর্থস্থানে বড় ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি দেখতেন। এসব উৎসব এলেই তারা 'নার্ভাস' বোধ করতেন। গণহারে যেহেতু তখন প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না –– সময়টাকে মোটা দাগে 'প্রি-ভ্যাকসিনেশন যুগ' বলতে পারি–– উদ্বেগ প্রকাশ করা ছাড়া উপনিবেশিক সরকারের বিশেষ কিছুই করার ছিল না। দলবেঁধে তীর্থযাত্রা, গঙ্গায় স্নান, ঈদের বড় জমায়েত ইত্যাদি সামাজিক প্রথায় হাত দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিরতই থাকতে হয় রাষ্ট্রপক্ষকে। বিশেষত ১৮৯৯ সালের প্লেগ দমনের একটা পর্যায়ে বোম্বাই ও অন্যান্য শহরে যখন দাঙ্গা বেঁধে যায়, তার পরে আর রাষ্ট্রশক্তি জনজীবনে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য নীতির উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা নয় (যা ছিল ভূদেব রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের উদ্দেশ্য)–– বরং নিজেদেরকেই মহামারী বা মারীর 'অশুভ হাওয়া' থেকে রক্ষা করা। এলক্ষ্যেই ইংরেজ সৈন্য, অফিসার ও রাজকর্মচারীরা যেখানে থাকতেন, সেগুলোকে 'মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট'-এর আদলে শহরের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি শহরে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ইংরেজদের চলাফেরা, রাস্তাঘাট, বাসস্থান, ক্লাব, খেলার মাঠের জন্য স্বতন্ত্র এলাকা, যার সংস্পর্শে আসার কোনো সুযোগ ছিল না 'নেটিভদের'। ক্লাবের বাইরে যে লেখা থাকত 'ইন্ডিয়ানস এন্ড ডগস আর নট এলাউড'–– এটা হয়ত ক্যান্টনমেন্ট-মডেলে আবদ্ধ থাকার জনস্বাস্থ্য-নীতিরই এক অন্য প্রকাশ। দীপেশ চক্রবর্তী তাই লিখেছেন: ১৯০৯ সালে ক্যান্টনমেন্টস্ ম্যানুয়ালে লেখা হল – 'একথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে...ক্যান্টনমেন্টগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সৈন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। অন্য সবকিছুরই স্থান তার নীচে।' এভাবেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শহরে ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইন, হিল স্টেশন, সামার রিসোর্ট ইত্যাদি। এক কথায়, প্রথম প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর হলো, উপনিবেশিক আমলের জনস্বাস্থ্য নীতি ছিল বৈষম্যমূলক এবং সেখানে জনগণের কোনো স্থান ছিল না। এটি ছিল মূলত এলিটদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক জনস্বাস্থ্য নীতি। জনগণ পেত তার নিজস্ব বিশ্বাসে-

চর্চায় ঘেরা এক সংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ স্বাস্থ্যখাত, আর এলিটরা পেত সেকালের মানদণ্ডে আধুনিক ও উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে জীবন ধারণের সুযোগ-সুবিধে।

এই দ্বৈত-খাত বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য-চিন্তা উপনিবেশ উত্তর আধুনিক রাষ্ট্রেও পরিলক্ষিত হয়। এদেশে তাই দেখতে পাচ্ছি যে স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছরেও 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা' গড়ে ওঠেনি যেখানে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেই ন্যূনতম এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পাবেন নির্ভরযোগ্যভাবে। কেন গড়ে ওঠেনি তার একটা কারণ বোধকরি এই যে, এলিটরা ভেবেছিলেন তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য 'জনস্বাস্থ্য' জাতীয় কোনো ব্যবস্থার আদৌ দরকার নেই। সেরকম বিপদ এলে বিদেশ গিয়ে চিকিৎসা লাভ করা যাবে। ব্যাংকক, সিংঙ্গাপুর, দিল্লী, বাঙ্গালোর তো এমন কিছু দূরত্বে অবস্থান করছে না! কিন্তু এখন করোনাকালের লকডাউনের কারণে তাদের বিদেশ যাওয়া বন্ধ। এখন বুঝি তারা বুঝতে পারছে, আমদানি-নির্ভর না হয়ে দেশের ভেতরেই সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া বর্তমানের মহামারী-সংকট তো নয়ই, ভবিষ্যতের কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকিও মোকাবেলা করা যাবে না। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে আদৌ আশাবাদী নই। বিল গেটসের মতো আমিও মনে করি, পরিবর্তন আসে তবেই যদি মনে থাকে। কিন্তু মানুষের স্মৃতি খুবই স্বল্পায়ু।

৬। মহামারীর প্রভাবঃ রাষ্ট্রে-দর্শনে

প্লেগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রভাব বিশ্বজুড়েই পড়েছে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে। এই প্রভাব যেমন পড়েছে সমাজে-রাষ্ট্রে, তেমনি সাহিত্যে-দর্শনে। সামগ্রিকভাবে মানবজীবনের ইতিহাসে। অতীত আলোচনার একটি তাৎপর্য উপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনার ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তার সুবিখ্যাত 'রেকুইম ফর এ নান' উপন্যাসের একটি উক্তি অনেকটা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে– The past is never dead. It's not even past। এবার করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শুরুর দিকে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ব্যক্তি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে আবেদন করেছিলেন একথা জানতে চেয়ে, কেন তাদেরকে রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে 'কোয়ারেন্টিনে' থাকতে বাধ্য করছে? স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে তাদের কি মুক্ত থাকার অধিকার নেই? এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরে যেতে হল অতীতে –– ১৮৯৭ সালের 'এপিডেমিক ডিসিসেস এ্যাক্ট' কে সাক্ষী মানতে হল। মমতা বললেন, 'যাতে কেউই আরোগ্য লাভ না করে কোয়ারেন্টিন থেকে পালিয়ে যেতে না পারে – জনগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার স্বার্থে – [১৮৯৭ সালের] আইন পুনরুজ্জীবিত করা হল।'

অতীত যদিও নবায়িত হয়ে ফিরে আসে পুনরায়, অবস্থা-ভেদে তার প্রত্যাবর্তনের 'ইমপ্যাক্ট' হয় বিভিন্ন রকম। মহামারীর অভিঘাত বিভিন্ন সমাজে ও কালে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে এসেছে। মহামারী প্রতিরোধে ইউরোপের চিন্তার বিবর্তন উঠে এসেছে মিশেল ফুকোর লেখায়। লন্ডনের 'দ্য গ্রেট প্লেগ' (যা ছিল ব্যুবনিক প্লেগ)– এর প্রাদুর্ভাব ঘটে লন্ডন শহরে ১৬৬৫ সালে। এতে শহরটির ১৫ শতাংশ নাগরিকই মৃত্যুবরণ করেন। এই প্লেগে আরও অনেক বেশি লোকের মৃত্যু হতে পারত, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে যেভাবে পারে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং রাজা (দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব তখন) তার সভাসদসহ অক্সফোর্ডে পালিয়ে যান। আজকে যেখানে অলগেট (Aldgate)– যেখানে এখন অধিকাংশ বাঙালি ও অভিবাসীরা বাস করেন– সেই এলাকাটিকে প্লেগে নিহতদের গণকবর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল সেদিন। এরকমই আরেকটি গণকবর ক্ষেত্র ছিল ফিনস্‌বিউরি ফিল্ডস্। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ছিল জনতার প্রতিক্রিয়া। যে-বাড়িতে কোনো প্লেগের রোগী পাওয়া যেত সেই বাড়িকে বাইরের থেকে সীল-

গালা করে বন্ধ করে দেওয়া হত। এতে করে ঐ খানার অন্যান্য সদস্যদেরও মৃত্যু হত – প্লেগে অথবা অনাহারে! ঠিক পরের বছরে (১৬৬৬ সালে) লন্ডনে অগ্নিকান্ডে তার পুরো কেন্দ্রস্থলই ভস্মীভূত হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, এই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল প্লেগবাহী ইঁদুরেরা। এই প্লেগ হওয়ার প্রায় ৬০ বছর পরে রবিনসন ক্রুসোর লেখক ড্যানিয়েল ড্যাফো লেখেন 'এ জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ার'। ড্যাফো প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, কিন্তু এমন ভাবে লিখেছেন বিবরণী যেন তিনি ঘটনা-পরম্পরার সামনেই অবস্থান করেছিলেন।

১৩৪৬-৪৮ সালের 'ব্ল্যাক ডেথ' আর ১৬৬৫ সালের 'গ্রেট প্লেগ' দুটিই ছিল প্লেগের মহামারী।[৮] এই অভিজ্ঞতা থেকে দুটো সুস্পষ্ট প্রবণতা বেরিয়ে আসে যা রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা-প্রয়োগের পরিবর্তে 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার' (Disciplinary Power) বা জনজীবনে নিয়মশৃঙ্খলা আচরণ ভিত্তিক ক্ষমতা-প্রয়োগের দিকে প্ররোচিত করে। রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রকৃতিতে এই পরিবর্তন আসত না যদি-না প্লেগের মতো মহামারী হত। এই মহামারীর সুবাদে রাষ্ট্র বাধ্য করে নাগরিকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলতে। নাগরিকদের সমস্ত জীবনচর্চা তখন থেকে 'কোয়ারেন্টিন' মডেলে আবর্তিত হতে থাকে। এভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের ইচ্ছার কাছে বশীভূত হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যস্ততায়। উদ্ভাবিত হয় জবরদস্তিমূলক কোয়ান্টোইনের পাশাপাশি 'স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন থাকার' (বা সেলফ আইসোলেশন) অভ্যেস। করোনার কালেও এখন আমরা এদেশে বা বিশ্ব জুড়েই ডিসিপ্লিনারি পাওয়ারের প্রয়োগ দেখছি। বিদেশ ফেরত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ বেশ গুরুত্বের সাথেই বলেছেন যে তাদেরকে এয়ারপোর্টে '১৪ দিনের' সেলফ্ কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে এবং সেটি তারা এখন নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। করোনার মধ্য দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রেরও একটি নতুন দিকের উন্মোচন হয়েছে সেটি হচ্ছে 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার'-এর বলয়। প্রতিদিন রোগতত্ত্ব বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য বুলেটিন পড়ে শোনাচ্ছে টিভিতে এবং নাগরিকেরা তা শুনে তাদের প্রাত্যহিকের জীবনযাপনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন –অন্তত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায়। কোয়ারেন্টিন বা সেলফ্ কোয়ারেন্টিনে থাকছে সংক্রমিত খানাসমূহ (ব্যক্তি বা পরিবার), কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সমগ্র পাড়া বা গোটা এলাকাই। এভাবেই শৃঙ্খলাবদ্ধ নাগরিকে পরিণত হচ্ছি আমরা––হয়ত ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, কোরিয়া, চীন বা সিঙ্গাপুরের মতো অতটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নই এখনো––কিন্তু গতিমুখটা সেদিকেই। একটা চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানকে অবলম্বন করে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করছে রাষ্ট্র। এটি খারাপ না ভালো সে বিবেচনায় ফুকো যাননি। তিনি শুধু দেখিয়েছেন কীভাবে ডেসপট বা স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে শাসন করার পরিবর্তে অন্য ধরনের বিশেষায়িত 'ক্ষমতারও' উদ্ভব হয়, এবং রাষ্ট্র তার প্রজাকূলের ওপরে প্রভুত্ব করার জন্য একটি বাড়তি হাতিয়ার পেয়ে যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে প্লেগ নামক মহামারী প্রতিরোধ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রচলিত দমনমূলক যন্ত্রগুলোর পাশাপাশি এই অদৃষ্টপূর্ব শৃঙ্খলাপরায়ন অভিব্যক্তি, ক্ষমতা ও সমাজের উদ্ভব হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দীপেশ চক্রবর্তী ও অন্যান্যদের সূত্র ধরে উপনিবেশিক পটভূমিতে মহামারী মোকাবিলার ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে আমরা 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার' এরই প্রয়োগ দেখেছি। যার ভিত্তি ছিল কোয়ারেন্টিন মডেল এবং শ্বেতাঙ্গদের জন্য 'বিচ্ছিন্ন থাকার' ক্যান্টনমেন্ট মডেল, যা নেটিভদের কাছ থেকে উপনিবেশের অফিসার-সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য তৈরি হয়েছিল।

[৮] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Bell (2001); Ziegler (1997)। ।

তবে ১৮২৬-৩৭ সালের একের পর এক বিধ্বংসী কলেরা মহামারী প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে খোদ ইংল্যান্ডেই এই কোয়ারেন্টাইন ও সেলফ্ আইসোলেশন ভিত্তিক 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার'-এর মডেল প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই মহামারীকে 'এশিয়াটিক কলেরা প্যানডেমিক' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয় যেহেতু এটার উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, বঙ্গদেশে। বাংলায় এই মহামারীর শুরু ১৮১৭-২৪ কালপর্বে; ধীরে ধীরে তা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগের জন্য হয়ত কার্যকর ছিল, কিন্তু কলেরা কোয়ারেন্টিন মানে না। এর জন্যে দরকার হয়ে পড়েছিল জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আরও সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির। ঠিক এরকম সন্ধিক্ষণে জন্ম নিল আরেক অদৃষ্টপূর্ব অভিব্যক্তি, ক্ষমতা ও সমাজ – যার ভিত্তি হল 'বায়ো-পাওয়ার' (Bio-Power)। এর মানে এই নয় যে আগের শৃঙ্খলাপরায়নতা-ভিত্তিক ক্ষমতার প্রয়োগ বা ডিসিপ্লিনারী পাওয়ার রাষ্ট্র-ক্ষমতার বলয় থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষা না করে আর কাজ চালানো যাচ্ছিল না। কলেরা, বসন্ত, হাম,যক্ষা প্রভৃতি রোগের ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল Bio-Power-র কথা ভাবতে।[৯] ১৮৩০-র দশকে চার্টিস্টদের আন্দোলনের পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছিল শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্যা –– তাদের জীবনযাপনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যা ছিল কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রজনন-ক্ষেত্র। শ্রমিকদের অমানবিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে তরুণ মার্কস লিখেছেন সেসময়ে 'দ্য হাউসিং প্রবলেমস্', আর তরুণ এংগেলস্ লিখেছেন 'কন্ডিশনস্ অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড'। এক কথায়, Disciplinary Power স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে তার একচ্ছত্র হেজিমনি হারালো নতুন পরিস্থিতিতে। তবে এর প্রয়োগ যথারীতি চলতে থাকল জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রে--বিশেষত কলকারখানায়, জেলখানায় এবং বিদ্যানিকেতনে (ফুকো সেসম্পর্কে আলাদা করে লিখেছেন তার 'ডিসিপ্লিন এণ্ড পানিশ' বইতে)।

১৮৯৭ সালের উপনিবেশিক ভারতের 'এপিডেমিক ডিজিজেস এ্যাক্ট' ডিসিপ্লিনারি পাওয়ারকে তুলে ধরেছে। প্লেগে সংক্রামিত হলে সরকারি পাইক-পেয়াদা দিয়ে ধরে বেধে হাসপাতালে বা কোয়ারেন্টিনে পাঠানোকে আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়েছে সেখানে। উপনিবেশিক আমলের প্রায় পুরোটা জুড়েই এই জোর-করে 'বিচ্ছিন্ন রাখার' নীতিই কার্যকর ছিল। আমরা আগেই দেখেছি, প্রকৃত অর্থে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি, বা উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতির বহুল প্রসার করার দিকে অগ্রসর হয়নি উপনিবেশের সরকার। সেটা হলে আমরা উপনিবেশিক বায়ো-পাওয়ারকে বাস্তবে প্রয়োগ হতে দেখতে পেতাম। ১৮৯৭ সালের এপিডেমিক ডিজিজেস এ্যাক্ট যখন প্রণীত হচ্ছে, তার পরের বছরেই কলকাতায় প্লেগের আক্রমণ হবে, আর ১৮৯৯ সালে বোম্বাই শহরে লেগে যাবে প্লেগ নিয়ে দাঙ্গা। অর্থাৎ ডিসিপ্লিনারি পাওয়ারের 'ডিসিপ্লিন' উপনিবেশের পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন করা যায়নি। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (ভূদেব ১৮৮২/২০১০খ) এনিয়ে ইতোপূর্বেই কড়া অভিযোগ তুলেছিলেন এই বলে যে, ভারত বর্ষে ৬০ বছর ও তার উপরে বয়স্ক লোকের সংখ্যা (১৮৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) মাত্র ৪ শতাংশ। এর কারণ, এখানে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি, এবং অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দুর্ভিক্ষে অথবা কিছুদিন পর পর ঘটে যাওয়া মারীতে-মহামারীতে ভারতবর্ষের মানুষ অকালেই মারা যাচ্ছে। ভূদেব অভিযোগ তুলেছিলেন, 'অন্যূন পাঁচ কোটি ভারতবাসী অর্ধাশনে জীবন যাপন করে ... এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগারো বৎসর অন্তর ভরতবর্ষে একটি

[৯] 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার' ও 'বায়ো-পাওয়ার' বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Foucault (1980); Foucault (1990)।

করিয়া বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাহার পরেই একটি করিয়া মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়।' এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। প্রায় একই সময়ে লেখা 'এবার ফেরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেন 'চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু' লিখেছেন তার কারণটি বোঝা সহজ হয়ে ওঠে।

ফুকোর ভাষ্য থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে মহামারী রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন ও ধারণাকে বদলে দিয়েছিল। রাণী ভিক্টোরিয়া উনিশ শতকে লন্ডন শহরে পয়:নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এভাবেই সেখানে গড়ে উঠে আন্ডারগ্রাউন্ড স্যুয়ারেজ সিস্টেম (যেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জার্মান বিমান হামলার সময় রাত্রিকালীন 'শেল্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল)। এই-যে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হলো মহামারী থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য তাকেই ফুকো বলেছেন Bio-Power। উপনিবেশের দেশসমূহ এই Bio-Power-এর সুবিধেটুকু পায় নি।

৭। নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া

স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনস্বাস্থ্য- কার্যক্রমের কার্যত অনুপস্থিতির ফল হয়েছিল মারাত্মক। তাদের বড় একটি অংশ ঝুঁকে পড়েছিল বিভিন্ন রোগের দেব-দেবীর (দেবীরই প্রাবল্য সে তালিকায় অবশ্য বেশি) সাধনায়, আর ক্ষুদ্র একটি অংশ রমেশ বা জগমোহনের মতো নিয়োজিত ছিল আত্মশক্তি-অনুপ্রাণিত স্বনির্ভর স্বাস্থ্য কার্যক্রমে। এদের একটি ধারা 'স্বাস্থ্য-জাতীয়তাবাদে' উদ্বুদ্ধ হয়ে 'স্বাস্থ্য-সাম্রাজ্যবাদকে' প্রতিহত করতে চেয়েছে অনেকটা ভাবাদর্শগত বা রাজনৈতিকভাবে প্ররোচিত হয়েই। এ প্রসঙ্গে ১৯৩০-র দশকে প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য-গীতার' উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাধারণ পঞ্জিকার তুলনায় এই 'স্বাস্থ্য-গীতার পার্থক্য ছিল এই যে, এখানে শুধু গ্রহ-তিথির আসা-যাওয়ার সংবাদই থাকত না, স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শও দেওয়া হত। গীতার সদুপদেশ কে-ই বা শুনে বা মনে রাখে, কেননা তার বক্তব্য বেশ জটিল। পঞ্জিকাকে যদি 'স্বাস্থ্য-গীতা' করে তোলা যায়, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পরামর্শ বৃহত্তর (শিক্ষিত) জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সেসব স্বাস্থ্য-পরামর্শের মধ্যে দুটি ধারা ছিল। একটি হচ্ছে, বিদেশী বিশেষত এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচনা; অপরটি হচ্ছে দেশীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রশংসা। বিদেশী চিকিৎসার পদ্ধতি এদেশে অচল, কেননা বিদেশী জীবন চর্চার ধরন এদেশের জল-হাওয়ার সাথে মিলবে না। এদেশের মানুষের শরীরের উন্নতির জন্য চাই এর সংস্কৃতি-ধর্ম-পরিবেশের উপযোগী স্বাস্থ্য-জ্ঞান। ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর সমর্থকরা যেভাবে টীকা দিয়ে বা সুঁই ফুঁটিয়ে রোগ নিরাময় করতে চাচ্ছে, এটা আপামর জনগণের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আছে এদেশেরই শত শত বছর ধরে চলে আসা প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র। এই অভিমত স্পষ্টতই 'স্বাস্থ্য-জাতীয়তাবাদ'। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের তত্ত্বকে এরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন– প্রায় 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত' বলে ভেবেছেন –এক প্রকার 'স্বাস্থ্য-সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। ফুকোর ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার ও বায়ো-পাওয়ার ধারণার থেকে এই প্রতিরোধের ডিসকোর্স একেবারেই আলাদা। একে নিছক 'আধুনিকতার' সাথে 'প্রাগ্-আধুনিকতার' দ্বন্দ্ব, বা 'প্রগতিপন্থা' আর 'রক্ষণশীলতার' মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসেব চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। এই দ্বন্দ্ব তৈরিই হত না, বা হলেও এতটা তীব্র আকার ধারণ করত না, যদি উনিশ-বিশ শতকে এদেশের

মহামারী বা মারীর উদ্ভব মোকাবেলায় ইংরেজ সরকার প্রকৃত অর্থেই জনগণের স্বাস্থ্য-পরিস্থিতি বা জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতেন।

এক্ষেত্রে আমি মো: উমর মুশতাকের 'পাবলিক হেলথ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া: এ ব্রিফ একাউন্ট অফ দ্য হিস্টরী অফ মেডিক্যাল স্টাডিজেস্ এন্ড ডিজিজ প্রিভেনশন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' প্রবন্ধটির সাহায্য নিয়েছি। সবিস্তারে বলি। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৬৮ সালে বাংলায় একটি পৃথক 'সিভিল মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' গঠিত হয় এবং ১৮৬৯ সালে একটি 'পাবলিক হেলথ কমিশনার'-এর পদ সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই বিভাগ ছিল কেন্দ্রিয় সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সাংবিধানিক সংস্কারের পরেই সুস্বাস্থ্য, সেনিটেশন এবং জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত 'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্‌স' বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৮৮০ সালে পৌরসভা এলাকায় এবং ক্যান্টনমেন্টগুলোতে বাসরত সকল শিশুদের জন্য টীকা দান বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এর প্রয়োগ সীমিত ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮০-৮১ সালে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে টীকা দানের হার ছিল মাত্র ২.৭ শতাংশ; ১৯০২-০৩ সালে তা সামান্য বেড়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। এর একটা বড় কারণ, উপনিবেশের গ্রামাঞ্চল এই টীকা কার্যক্রমের বাইরে ছিল। অথচ কিছুদিন পর পর মহামারীর মুখোমুখি হতে হয়েছে উপনিবেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে। যেমন, প্লেগ হয়েছে ১৮১২ সালে গুজরাটে ও সিন্ধু প্রদেশে (প্রায় ১০ বছর ধরে চলেছিল এর তাণ্ডবলীলা); হয়েছে ১৮২৮-২৯ সালে পাঞ্জাবে; ১৮৩৬ সালে রাজপুতানায়; ১৮৯৬ সাল থেকে ব্যুবনিক প্লেগ প্রথমে মারাত্মক আকার ধারণ করে বোম্বাই, পুনে, কলকাতা ও করাচীর মতো বড় বড় শহরে, এবং পরে সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে যায়। এক হিসাবে, ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্লেগের কারণে মারা যায় প্রায় ২০ লাখ লোক। এবার আসি কলেরার প্রসঙ্গে। ১৮১৭-২১ সাল জুড়ে মহামারী হিসেবে কলেরা বাংলা থেকে শুরু হয়ে একসময় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী করা হয় ট্রপিক্যাল দেশের জন-হাওয়াকে, এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে দলবেঁধে মেলা উদযাপন, ধর্মীয় উৎসব পালন, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি 'সাংস্কৃতিক উপাদানকে'। ১৮৬৮ সালে এসে কলেরা মহামারীর কারণ খতিয়ে দেখতে সর্বপ্রথম 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' করে উপনিবেশিক সরকার। কলেরা রোধে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা এনিয়েও কমিটির মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে, পাঞ্জাবে, বাংলায় কলেরা প্রায় প্রতি বছরই দেখা দিয়েছিল। একই কথা খাটে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে। তবে এক্ষেত্রে ১৮৮১ সালের পর থেকে কিছুটা 'ব্রেক-থ্রু' হয়। সেটা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেস্-এর অধীনে সদ্য যোগ দেওয়া সার্জেন্ট মেজর রোনাল্ড রস-এর গবেষণার কারণে। মাত্র আড়াই বছরের মাথায় এনোফিলিস মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ছড়ানোর চক্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন (এর জন্য ১৯০২ সালে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান)। কুইনাইনের বড়ি চালু হওয়ার পরেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলতেই থাকে, তার একটি বড় কারণ হল মশার বিস্তার রোধে ব্যর্থতা এবং 'ড্রেনেজ সিস্টেমের' শোচনীয় পরিস্থিতি। এত সাতকাহন সবিস্তারে উল্লেখ করার কারণ হলো, উনিশ-বিশ শতকে (স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত) কী জনস্বাস্থ্যের সার্বিক পরিস্থিতিতে, কী বিভিন্ন মহামারীর বিস্তাররোধে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়নি উপনিবেশের পটভূমিতে। উপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে দমন-পীড়ন-লুণ্ঠনের অভিজ্ঞতা কেবল পেয়েছে এদেশের জনগণ, কোনো 'বায়ো-পাওয়ার'-এর অভিজ্ঞতা মেলেনি তাদের। সন্দেহ কী, স্থানীয় জনগণের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতি ও পাশ্চাত্যের প্রচার করা 'জনস্বাস্থ্যের' ধারণার বিরুদ্ধে একধরনের বিরূপ ও প্রতিরোধী মনোভাব এখানে গড়ে উঠবে। সেকালের পঞ্জিকা ঘাটলে এরকম

প্রতিরোধের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে শনাক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে প্রবীর মুখ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁজিতে স্বাস্থ্যচর্চা' প্রবন্ধের ওপরে (গৌতম ভদ্র সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক' পত্রিকায় প্রকাশিত) আমি নির্ভর করেছি।

মহামারীর মুখে পড়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের জয়গান গাওয়া হয়েছে এভাবে:

'যুগে যুগে সামাজিক রাষ্ট্রীয় আকার,
কিছু কিছু রূপান্তর হয় বটে তার।
অবিকৃত কিন্তু স্বাস্থ্য-বিধি সনাতন;
হাসিমুখে বলিয়াছি সে সব বচন,
চরক, সুশ্রুত, অত্রী, হায়ীত, নারদ,
মনু, পরাশর আদি লিখেছে বিশদ,
আয়ু রক্ষণের কত মহামূল্য কথা!
ঘটে দু:খ সে সবার করিলে অন্যথা।'

যেটা বিস্ময়কর, মহামারীর কারণ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে সনাতন ধর্মের পতন এবং ক্রমবর্ধমান অনৈতিকতাকে। অবশ্য পাশাপাশি পাশ্চাত্যের জীবাণু তত্ত্বেরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অগ্রাধিকার স্বীকার করেই।

ধর্মের পতন এবং নৈতিকতার স্খলন যে স্বাস্থ্যহানির জন্য দায়ী তাতে স্বাস্থ্য-গীতার লেখকদের মনে কোনো সন্দেহ নেই:

'বিরুদ্ধ ভোজন আর অহিত ভোজন,
অসাধু আলাপ, বৃথা কালের যাপন;
পুষ্করিণীতে শৌচত্যাগ, ঘরে থুথু ফেলা,
বাসিমুখে পানাহার, নিদ্রা সন্ধ্যা বেলা,
অবৈধ সঙ্গম আদি বদভ্যাস হয়;-
জানিবে শাস্ত্রীয় বাক্য মিথ্যা ইহা নয়।'

পাশ্চাত্যের জীবাণু-তত্ত্বের সাথে মেশানো হয়েছে প্রাচ্যীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র। এসেছে মহামারী প্রতিরোধের প্রসঙ্গ:

'এইবার বলি কিছু জীবাণু-জীবন;
বিবিধ রোগের যারা প্রধান কারণ।
আয়ুর্বেদে ইহাদেরই সূক্ষ্ম কৃমি নাম,
এদেরই মারণ-মন্ত্র দেছে যজু: সাম।
যত কিছু সংক্রামক প্রাণহারী ব্যাধি,

এই সূক্ষ্ম জীবদান সে সবার আদি।
বিসূচিকা, ক্ষয়কাস, ম্যালেরিয়া আর,
দাঁতের গোড়ার রোগ, ধুনষ্টংকার,
তালু-ক্ষত, বাতশ্লেষ্মা, আর কালাজ্বর,
আমাশয় আদি জন্মে জীবাণু-ভিতর।
চর্ম্মচক্ষে ইহাদের দেখা নাহি যায়;
নিতে হয় অনুবীক্ষ্য-যন্ত্রের সহায়।'

দেখা যাচ্ছে, ১৯২৬ সালের এই পঞ্জিকাটিতে যেধরনের 'স্বাস্থ্য-জাতীয়তাবাদ' প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে যেমন আছে সনাতনী রক্ষণশীলতা, তেমনি আছে আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গি। আয়ুর্বেদ এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর মধ্যে একটা সংশ্লেষণ করে ভারতীয় ধারার একটা আধুনিকতা সৃষ্টিরও চেষ্টা পাই এতে। এই 'স্বাস্থ্যধর্ম গৃহ পঞ্জিকা' বের করেছিলেন কার্তিক চন্দ্র বসু – তিনি নিজে পাশ্চাত্য ডাক্তারী বিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যালসে যোগ দেন। একপর্যায়ে রোগ নিরূপণ ও ভেষজ ঔষুধ তৈরি করার জন্য নিজেই শুরু করেন 'বোসেজ ল্যাবরেটরি।' পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথে ভেষজ তত্ত্বের মিল ঘটিয়ে নতুন একটা ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। এভাবেই মহামারী স্বাস্থ্য-জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছিল।

তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বাস্থ্য-জাতীয়তাবাদের সাথে শহরের এবং গ্রামের নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রতিদিনের জীবিকা অর্জনের সংগ্রামের মধ্যে যখন তারা মারী বা মহামারীতে আক্রান্ত হতেন, তখন তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল দূরের ঈশ্বর যাকে তারা নানা দেব-দেবীর বিগ্রহ মূর্তিতে পূজা করত। এই ঐতিহ্য পুরাকাল থেকেই চলে আসছে। কুশান যুগে যক্ষ-দেবী হারিতি (Hariti)-এর পূজা করা হত–ইনি তুষ্ট থাকলে সকল আপদ-বালাই থেকে রক্ষা করতেন। এর মধ্যে ছিল গুটিবসন্ত, উচ্চহারে শিশুমৃত্যু, জন্ম দিতে গিয়ে মাতৃমৃত্যু প্রভৃতি। কথিত আছে, পরে তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যা হয়ে বৌদ্ধ দেবী হয়ে ওঠেন। কনিষ্ক সাম্রাজ্যে গুটিবসন্তের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বৌদ্ধ-স্তুপার ভেতরে হারিতিকে উৎসর্গ করা বিগ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়। হারিতি দেবীর ক্ষমতা ছিল জ্বরের উচ্চমাত্রাকে নিচে নামিয়ে দেওয়ার, এর ফলে যে কোনো জ্বরকে শীতল করার দেবী হিসেবেও তাকে দেখা হয়। পরবর্তীতে এই হারিতি দেবীই বাংলায় এসে হয়ে ওঠেন লোক-দেবী শীতলা–নামের ভেতরেই তার ক্ষমতার উল্লেখ রয়েছে। 'শীতল করে দিতে পারেন' সব জ্বরকে, এবং এভাবেই তিনি সারিয়ে তুলেন জ্বরের রোগীকে। শুধু গুটিবসন্ত নয়, সকল জ্বরের উপশমের দেবী হচ্ছেন এই শীতলা দেবী। অন্ত্যজ শ্রেণির নাপিত, মুচি, কামার, কুমোর, চর্মকার প্রভৃতি পেশাবর্গের মধ্যে (সাধারণভাবে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক শ্রেণির ভেতরে) শীতলা দেবীকে জাগ্রত দেবী হিসেবে সাড়ম্বরে পূজা করা হয়ে থাকে এখনো। লোক-কল্পনায় কোনো অজ্ঞাত কারণে শীতলা দেবীর বাহন হচ্ছে গাধা–হয়ত ভারবাহী প্রাণীকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে বাহন রূপে। গুটিবসন্ত ও হামের দেবী যেমন শীতলা, তেমনি কলেরার দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ওলাই চন্ডী (হিন্দুদের মধ্যে) এবং ওলা বিবি (মুসলমানদের মধ্যে)। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক রালফ্ নিকোলাস মনে করেন যে, বাংলায় লোক-দেবী হিসেবে মনসা ও শীতলা উভয় দেবীরই পূজা বলেও শীতলাই খানিকটা এগিয়ে

আছেন। অন্য কিছু চর্চায়, সর্পদেবী মনসা ও ষষ্ঠীর সাথে শীতলা দেবীকে অভিন্ন জ্ঞান করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের পূর্বকথিত ১৮৯৯ সালের প্লেগের সময়ে এক 'প্লেগমাতার' আবির্ভাব হয়েছিল, তার নাম ছিল 'বোম্বাই কি মায়ান', কিন্তু তার পূজা হত শীতলা মন্দিরে। এ নিয়ে I. J. Catanach তার 'প্লেগ এন্ড দ্যা ইন্ডিয়ান ভিলেজ: ১৮১৬-১৯১৪' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে শীতলা দেবীর নাম প্রদেশ ভেদে ভিন্ন হতে পারে। তামিলনাড়ুতে বসন্ত রোগের দেবীর নাম মারি আম্মা, দক্ষিণ আরকটে তার নাম কান্নি আম্মা। নাম যা-ই হোক, এইসকল লোকদেবীর পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্য একটাই –– জনস্বাস্থ্য-সেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে মহামারী থেকে রক্ষা করা।

নিম্নবর্গের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনাকে পাছে কেউ 'এশিয়াটিক বারবারিজম'-এর উদাহরণ হিসেবে খাটো করেন সেজন্য বলে রাখি যে প্লেগ-তাড়িত ক্যাথলিক ইউরোপে খ্রীষ্টের অনুসারীদের মধ্যে রোগ-নিরাময়ের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাত্মাদের কাছে 'প্রার্থনা করার' রীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। করোনা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' পত্রিকার ১৯ মার্চ ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এক চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ 'দ্য বেস্ট সেইন্টস্ টু প্রে ডিউরিং আ পেনডেমিক'। তাতে বলা হয় যে, প্লেগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য সেইন্ট হলেন সেইন্ট সিবাসটিয়ান। খ্রিষ্টিয় ৩য় শতকের এই পূণ্যাত্মাকে প্লেগ মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে 'উদ্ধারকর্তা' হিসেবে মনে করা হত। সিবাসটিয়ানের অর্চনার প্রমাণ মেলে রোমে ৬৮০ সালে, মিলানে ১৫৭৫ সালে, লিসবোঁয়াতে ১৫৯৯ সালের প্লেগের দিনগুলিতে। প্লেগের মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এমন আরেকজন ছিলেন সেইন্ট রোস (St Roch)। ইতালির এই পূণ্যাত্মার কাছে বিশ্বাসীরা আজও দুর্দৈবে পড়লে প্রার্থনা করে থাকে:

" O Blessed St Roch,
Patron of the Sick,
Have pity on those
Who lie upon a bed of suffering.

Your Power Was so great
When you were in this world,
That by the sign of the Cross,
Many were healed of their diseases.

Now that you were in heaven,
Your power is not less.
Offer, then, to God
Our sighs and tears.
And obtain for us that health we seek
Through Christ Our Lord
Amen."

এই তালিকায় নারী-সেইন্টারাও রয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেইন্ট রোজালিয়ার এর নাম। যারা গসপেল অফ মেরি-র খ্রীষ্ট-সহকর্মী মেরি মাগদালেনার কথা মনে রাখেন, তারাই জেনেছেন যে এই পূণ্যাত্মা নারীর নাম নিলে মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অন্তত এই ধারার বিশ্বাসীদের তাই অভিমত।

মুসলিম ঐতিহ্যেও আধ্যাত্মিক গুণাবলীসম্পন্ন অনেক পূণ্যাত্মা মহাপুরুষ পীর-আউলিয়া ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এসেছেন যাদের আশ্চর্যজনক 'নিরাময় ক্ষমতা' (হিলিং পাওয়ার) ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। নিত্যদিনের অসুখে-বিসুখে পড়লে এসব পূণ্যাত্মাগণের সমাধিস্থল বা মাজার শরীফে গিয়ে মানত করার লোক-ঐতিহ্য ছিল বা এখনো আছে। পূর্ব বাংলায় এই পরম্পরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 'মুসলিম সেইন্টস্ অব সাউথ এশিয়া: দ্য ইলেভেনথ্ টু ফিফটিনথ্ সেনচুরিস্' গ্রন্থে আনা সুভরভা লিখেছেন, মধ্যযুগে 'প্লেগের মহামারীতে দিল্লীর লোকজন একত্রিত হয়ে কুতবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি-র মাজারে জিয়ারত করতে গিয়েছিল'। সাধারণ মানুষের কাছে এসব পূণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের আবেদন ছিল ভরসা-প্রার্থনার একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে। রিচার্ড ইটন তার সুবিখ্যাত বইতে ('দ্য রাইজ অফ ইসলাম এন্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার') পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় (বিশেষত দক্ষিণ বঙ্গে), মাজারের তুলনামূলক অধিক সমাবেশ দেখিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে জঙ্গল কেটে বসত গড়ার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন এবং মানুষের বিপদে-আপদে পাশে থাকার কারণে এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার সহজতর হয়েছিল। কিষণ চন্দর হয়ত অতিশয়োক্তি করেছেন, কিন্তু দুর্দৈবের মুখে তার মা'র বিভিন্নমুখী ধর্মবিশ্বাস একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক সাধারণ মানুষই বিপদ থেকে বাঁচতে সব উৎসের দিকেই হাত বাড়াতেন। এখন হয়ত 'শিক্ষিতের' হার বাড়ার সাথে সাথে বহুত্ববাদী প্রবণতা অনেকখানি কমে এসেছে, তারপরেও তা পরিদৃষ্ট হয়। পুরো উদ্ধৃতিটি দেয়া প্রয়োজন। কিষণ চন্দর তার মা সম্পর্কে লিখেছেন:

'Creating for sacred places ran in my mummy's blood. She did not read books on national unity, did not hear speeches on religious tolerance and did not know words like humanism and equality of people….To make up for it she visited Hindu temple as well as Sikh *gurdwara*, prayed to Hindu gods and made offerings at the *mazars* of Muslim saints--and all this also ran in her blood. Thus, like her, lived whole generation in old, illiterate, undivided India and by their efforts in the course of many centuries was the composite national culture was created'.

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে, মানুষজন মহামারীর প্রভাবে আরও বেশি করে নিয়তিবাদের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে, বাহ্যিক ধর্মাচরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, লোকজ দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস বেড়ে যেতে পারে। তারা মনে করতে পারে যে মহামারী হচ্ছে পাপবিদ্ধ মানুষের ওপরে নেমে আসা অভিশাপ (যেমন করে গান্ধী ১৯৩২ সালের বিহারের ভূমিকম্পকে অতিরিক্ত জাত-পাত মানার জন্য বিধাতার ক্রুদ্ধ অভিশাপ বলে ভেবেছিলেন এবং এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারও কুড়িয়েছিলেন) যেন এক অদৃশ্য অনিয়ন্ত্রণক্ষম শক্তি আমাদের জীবন ও ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে– বিজ্ঞান যার কাছে অসহায়, রাষ্ট্র যার কাছে পরাস্ত, ব্যক্তিস্বরূপ যার কাছে অগ্রাহ্য। চারদিকের অসুখ-বিসুখে ক্লান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা' এমন ধারণা করাও

অযৌক্তিক নয়। মহামারীর ইতিহাস অবশ্য দু'ধরনের প্রবণতাই দেখায়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই ধারাকেই সামনে মেলে ধরে।

যেমন, ১৩৪৬-৪৮ সালের ব্ল্যাক ডেথ অভিহিত প্লেগের ফলে বিশ্বাসের বন্ধন অনেক খানি আলগা হয়ে এসেছিল। মধ্যযুগকে যে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়ে থাকে তার বড় একটি কারণ ছিল ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব। এই অন্ধকার যুগের পরেই রেনেসাঁ-পর্বের শুরু। প্লেগের কালো মহামারীর ৫০ বছরের মধ্যেই কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত, জনসংখ্যা হঠাৎ করে কমে যাওয়ায় সামন্ত-ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়। ইংল্যান্ডের কৃষিতে দাসপ্রথার ব্যবস্থা (তথাকথিত Villianage System) উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর একটা বড় কারণ মহামারী-পরিস্থিতিতে শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মজুরির হার বেড়ে যায়, কৃষিতে 'মুক্ত শ্রমের' চলাচল অবাধ হতে থাকে, কৃষিকাজ আর সামন্তদের জন্য আগের মতো লাভজনক হতে পারে না। কৃষিতে ভাগ বা বর্গা-ব্যবস্থার বিকাশ হতে থাকে। এর ফলে যারা মহামারীর পরে বেঁচে রইল, তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, সামন্তবাদের একটি অনুষঙ্গ হিসেবে ছিল প্রাত্যহিক জীবনে (ক্যাথলিক) চার্চের প্রবল প্রভাব। মধ্যযুগের 'পাপ-পুণ্যের থিওরী' দিয়ে মহামারীর আক্রমণকে আর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। অসুখ হলে এটা বিধাতার অভিশাপ, এবং এজন্যে অনুতাপ ও ক্ষমা চাওয়ার যে-প্রথা মধ্যযুগে সূচিত হয়েছিল, তা অনেকটাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। চার্চের সাথে জড়িত অনেক ধর্মযাজক তখন প্লেগের কারণে প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্লেগ পূণ্যাত্মা-পাপাত্মা কাউকেই নিস্তার দেয়নি। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের জন্য এটি ছিল একটি বড় আঘাত। এর মানে এই নয় যে, ধর্মবিশ্বাস মহামারী পরবর্তী যুগে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মধ্যযুগে জনজীবনের ওপরে ধর্মের যে-প্রবল সর্বগ্রাসী প্রভাব ছিল তা আর মহামারী পরবর্তী যুগে সেভাবে থাকেনি। এক্ষেত্রে ১৩৪৬-৪৮ সালের ব্ল্যাক ডেথকে যেমন বিবেচনায় নিতে হবে, তেমনি হিসেবে নিতে হবে ১৬৬৫ সালের লন্ডনের গ্রেট প্লেগকে। এ দুইয়ের মধ্যকার তিনশো বছরে ছোটবড় আরও অনেক প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ইউরোপে। তাছাড়া, প্লেগ ছাড়া জলবসন্তও হুমকি হিসেবে ছিল, এটাও মনে রাখতে হয়। মোট কথা, মহামারীর প্রভাবে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে জেগে ওঠা রেনেসাঁর ধারা (লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির যুগ) বা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁর ধারা (শেক্সপীয়ারের যুগ) 'মানবতাবাদকে' শিরোধার্য করেছিল, দেবত্ববাদকে নয়। ঈশ্বরের পাশাপাশি মানুষের গল্প-কথা তাই এই পর্বের চিত্রকর্মে, কবিতায়, নাটকে ও গল্পে উঠে এসেছে। একেই সমালোচকেরা 'Renaissance Humanism' বলেছেন। এর প্রভাবেই আমরা পেয়েছি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও বতিচেল্লির চিত্রকর্ম, বোকাচিও (Bocaccio)-র অমর সৃষ্টি 'ডেকামরন, চসারের 'ক্যান্টরবিউরি টেলস্', আর শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' (যা লেখা হয়েছিল ১৬০৬ সালের প্লেগের সময়ে যখন লন্ডনের গ্লোব থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় এবং যেখানে শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ হত) ও তার অন্যান্য ট্রাজিডিতে বিধৃত মানবতাবাদ। তৃতীয়ত, কালো মৃত্যু শুধু মানবতাবাদের পথই প্রশস্ত করেনি, বা চার্চের ওপরে সর্বজনীন আস্থায় চিড় ধরায়নি, রাষ্ট্র বা রাজশক্তির ন্যায্যতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। মহামারীর কালে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, অনেক ধর্মযাজক আর্তের সেবা দিয়ে মারা গেলেন, শহর জনশূণ্য হয়ে গেল, গ্রাম উজাড় হল, আর রাজন্য বর্গ লোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন। অন্ধকার যুগের মহামারী হিসেবে প্লেগ যেভাবে রাজশক্তির ন্যায্যতাকে নাড়া দিয়েছে, তা থেকে সামলে উঠতে বহু বছর/শতাব্দী লেগেছিল ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহকে।

উপরের কথাগুলোর সমর্থন পাওয়া যায় প্লেগের সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষক ফিলিপ জিগলার (Ziegler)-এর বইয়ের মাধ্যমে (Ziegler 1997)। আমি তিনটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তার লেখা থেকে তুলে দিতে চাই। মহামারী যে কীভাবে নৈতিক অবস্থার অধঃপতন ঘটায় সে সম্পর্কে জিগলার বলছেন:

> 'The plague not only depopulates and kills; it gnaws the moral stamina and frequently destroys it entirely; thus, the sudden demoralization of Roman society from the period of Mark Anthony may be explained by the Oriental plague… In such epidemics the best were invariably carried off and the survivors deteriorated morally. Times of plague are always those in which the bestial and diabolical side of human nature gains the upper hand.'

১৩৪৬-৪৮ সালের প্লেগের পরের কয়েক দশকে অবক্ষয়, অধঃপতন, এমনকি ভোগবাদের দিকে প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল বলে জিগলার মনে করেছেন। উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য:

> 'Contemporary chronicles abound in accusations that the years which followed the Black Death were stamped with decadence and rich in every kind of vice. The crime rate soared; blasphemy and sacrilege were a commonplace; the rules of sexual morality were floated; the pursuit of money became the be-all and end-all of people's lives…Who could doubt that humanity was slipping towards perdition when women appeared in public wearing artificial hair and low-necked blouses and with their breasts laced so high 'that a candlestick could actually be put on them'.

আবারো বলছি, তার মানে এই যে, ধর্ম-কর্ম সমাজজীবন থেকে মহামারীর কারণে উঠে গেল। চার্চের ভাবমূর্তি ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে চিড় ধরলেও চার্চের সংখ্যা আগে বেড়ে গিয়েছিল। জিগলার এই মুহূর্তকে শনাক্ত করেছেন এভাবে: 'Paradoxically, the decades that followed the plague saw not only a decline in the prestige and spiritual authority of the Church but also a growth of religious fervor. One example of this was the large number of chantry Chapels which were opened all over England…. In Italy, nearly, fifty new religious holidays were created', পাছে ঈশ্বরের কোপানল আরেকবার এসে পড়ে মর্ত্যবাসীর ওপরে! এই প্যারাডক্সের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জিগলার বলেছেন যে, মহামারীর কারণে ধনী ব্যক্তিরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা ভাবতে শুরু করেছিলেন নানা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের মধ্যে বুঝি 'পাপের গ্লানি' লেগে আছে। চার্চকে সেই অর্থের কিয়দংশ যদি দান করা যায় তাতে বুঝি তাদের অপরাধের বোঝা কিছুটা হাল্কা হয়! অবশ্য জিগলার এর পেছনে আরও নিগূঢ় অভিপ্রায় দেখেছেন। মহামারী পরবর্তী কালে চার্চের প্রভাব এতটাই ক্ষুন্ন হয়েছিল তাকে কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে জনঅসন্তোষ বেড়ে যেতে পারত এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে

জনবিদ্রোহের সূচনা হতে পারত। এ কারণেই চার্চসমূহকে অর্থ-সাহায্য করার জন্য ওরা এত উদগ্রীব হয়েছিলেন:

> 'Yet, perhaps even more than this, the frenzied charity in which the rich of Europe indulged during and after the Block Death demonstrated their faith in the one institution where it seemed a proper sense of social discipline survived. Discredited the Church might be in the eyes of many but, to the nobles and the monied elite, it was still the dyke which held back the flood of anarchic insurrection unless it were shored up then everything, it seemed, might be swept away.'

১৬৬৫ সালের প্লেগের ফলেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, ধারণা করা যায় ১৮৩০'র দশকের কলেরার প্রকোপ নিয়েও এমনটা ভাবা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে লন্ডনের গ্রেট প্লেগ-এর তুলনায় ঐতিহাসিকেরা বিশেষ করে সাক্ষী মেনেছেন গুটিবসন্তের মহামারীকে। উদাহরণত, ১৬৮৮ সালের 'Glorious Revolution' ছিল প্রথম বড় আকারের অভিঘাত-সম্পন্ন 'বুর্জোয়া বিপ্লব' (২য়টি ছিল, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা, এবং ৩য়টি ছিল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব)। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাজশক্তির নিরংকুশ দাপুটে ক্ষমতা অনেকখানি কমে যায়, এবং ধনাঢ্য বণিক-শিল্পপতি বুর্জোয়া-শ্রেণির প্রভাবাধীন 'সংসদের' রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে যায়। জায়মান বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক অধিকার/ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়, যা ছিল ধনবাদী বিকাশের পক্ষে খুবই সহায়ক (যার প্রমাণ মেলে শিল্প-স্থাপনে জমি-অধিগ্রহণ বা Land-enclosure নীতি বাস্তবায়নের মধ্যে)। যেটা আমাদের সচরাচর বোধের বাইরে ছিল, এই Glorious Revolution কে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল গুটিবসন্তের মহামারী। ব্যাপারটি কাকতালীয়, কিন্তু ঘটনা-প্রবাহ বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 'প্লেগস্ এন্ড পক্সেস: দ্য ইমপ্যাক্ট অফ হিউম্যান হিস্টরী অন এপিডেমিক ডিজিজেস' গ্রন্থের লেখক আলফ্রেড বোলেট (Bollet) জানিয়েছেন এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে। আমি এখানে তার বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

'রাজপরিবারের ওপরে বসন্তের মহামারীর প্রভাব প্রায়শ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২৯ বছর বয়সে প্রথম এলিজাবেথ ১৫৬২ সালে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন...১৬৬০ সালে ২য় চার্লস যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসলেন সিংহাসনের দখল নিতে, হেগ শহর থেকে তার দলবল জলবসন্তের মহামারীর বীজ বয়ে নিয়ে এসেছিল। তাতে চার্লসের সেই ভাই (গ্লস্টেরের ডিউক) এবং প্রিন্সেস মেরী মৃত্যুবরণ করেন। স্যামুয়েল পেপিস (Pepys)-এর দিনলিপি লন্ডনে ১৬৬১ সালের গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাবের বর্ণনা দিয়েছে।...এই মহামারীর কারণে বৃটিশ রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারেও পরিবর্তন আসে। ১৬৮৮ সালে রোমান ক্যাথলিক ধারার অনুসারী রাজা জেমস-দ্বিতীয়কে গ্লোরিয়াস রিভোলিউশনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় (জেমস ফ্রান্স পালিয়ে যান)। তখন জেমস-এর কন্যা মেরি (ও তার স্বামী উইলিয়াম) সিংহাসন লাভ করেন (তারা দুজনেই ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধারায় বিশ্বাসী)। কিন্তু ১৬৯৪ সালে মেরি গুটিবসন্তে মৃত্যুবরণ করেন কোনো সন্তানাদি না রেখেই। উইলিয়াম (William. III নামে পরিচিত) ১৭০২ সালে মারা গেলে মেরির ছোট বোন এ্যান (Anne) সিংহাসনে বসেন। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয় যখন এ্যান-র ছেলে বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে জলবসন্তে মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে সংসদে আইন পর্যন্ত পাশ হয় যে, পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া এরপর রাজ-পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বিদেশে ভ্রমণ করতে পারবে না। এ্যান-এর মৃত্যুর পরে ব্রিটিশ রাজ-

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন জার্মানিতে বাসরত রাজা জর্জ প্রথম। তারা বাড়িতে জার্মান ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তীতে এরাই ইংরেজি আদব-কায়দা-ভাষা আয়ত্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন উইন্ডসর ঘরানা (বা The Windsors) -যার উত্তরসূরী হচ্ছেন বর্তমানে ইংল্যান্ডের রাণী।' দেখা যাচ্ছে, জলবসন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে।

৮। মহামারী ও আধুনিক সাহিত্যের ধারা

১৯২২ সাল। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জন্মবছর এটি। একই বছরে প্রকাশিত হয় টি.এস.এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড', জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস্' উপন্যাস, আর ভার্জিনিয়া উলফ্-এর 'মিসেস ডেলাওয়ে'। এর তিন বছর আগে ইয়েটস্ লিখেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা 'দ্য সেকেন্ড কামিং'। এই সবগুলোর পেছনে কাজ করেছে একটাই 'ইউনিফাইং থীম' বা প্ররোচনা –– মহামারীর অশুভ ছায়া। ২০১৮ সালের ঠিক একশো বছর আগে বিশ্বজুড়ে যে মহামারী সংঘটিত হয়েছিল, তার নাম ছিল স্পেনিশ ফ্লু। তা নিয়ে ২০১৮ সালে কোনো কোনো সংবাদপত্রে ছোট্ট নিবন্ধ বেরিয়েছে, কিন্তু বড় আকারে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। অথচ এই স্পেনিশ ফ্লুতে মারা গিয়েছিল সেদিন বিশ্বের ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ; আক্রান্ত হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক। বস্তুত ১৩৪৬-৪৮ সালের ব্ল্যাক ডেথ-এর পরে স্পেনিশ ফ্লু-এর মতো ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা নিয়ে আর কোনো মহামারী আত্মপ্রকাশ করেনি। এই ফ্লু-তে যত লোকের প্রাণহানি হয়েছে, সমগ্র ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধ মিলিয়েও এত লোকের মৃত্যু ঘটেনি। তাহলে এই মহামারী নিয়ে এত নিস্তব্ধতা কেন? একটা কারণ হতে পারে– আর সেটা ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলেছিলেন যার সহজীকৃত মর্মার্থ হলো– 'Silences about public horrors can permit human societies to cope with collective recovery and to progress'। জীবনানন্দও বলেছিলেন বুঝি এই মর্মে– 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে'! হয়ত-বা তা-ই। কিন্তু সমসাময়িক এলিয়ট, উলফ বা ইয়েটস্-র পক্ষে এই অদৃষ্টপূর্ব মহামারীকে ভুলে যাওয়া কঠিন ছিল।

এলিয়ট আর তার স্ত্রী ভিভিয়ান এলিয়ট দুজনেই ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেনিশ ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যখন এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করছিলেন তারা, তখনই তিনি 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' শেষ করার কাজে হাত দেন। মহামারী যে প্রবলভাবে আক্রান্ত করেছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সাহিত্য ও শিল্পের ধারাকে সেটা শুধু সম্প্রতি সাহিত্য-সমালোচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। যেন দান্তের ইনফার্নোর মতো মড়ক লেগেছে লন্ডন শহরে, সেভাবেই কবি এলিয়টের চোখের সামনে মৃত্যুর মিছিল ভেসে উঠছে:

'Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone- so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street.'

সবাই জানেন যে এলিয়ট ওয়েস্ট ল্যান্ড কাব্যগ্রন্থে ধাঁধার মতো করে বলেছিলেন:

'April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.'

এপ্রিল কেন 'সবচেয়ে নিষ্ঠুর' মাস হতে যাবে? যে-জমি উর্বরা সেখানে এপ্রিল মাসে বসন্ত সমাগত হয়, পশ্চিমের দেশগুলোয় বরফ গলতে শুরু করে, আর বরফের নিচ থেকে মাথা তুলতে শুরু করে হরিৎ তৃণ-গুল্ম, নানা বর্ণের ফুল, আসে নতুন ফসলের মৌসুম। কিন্তু বন্ধ্যাজমিতে (ওয়েস্ট ল্যান্ড তো অপুষ্পক জমি) এপ্রিল মাস মিছে মিছি বসন্তের আশা যোগায়–সেখানে নতুন করে কিছুই জেগে ওঠে না–না পুষ্প, না পত্রালী, না মৌমাছির গুঞ্জন, না প্রজাপতির আলোড়ন। সেদিক থেকে এপ্রিল যেন আমাদের অপূর্ণতাকে না-পূরণ হওয়া সম্ভাবনাগুলোকে নিয়ে কর্কশ ঠাট্টা করছে। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো কিছু আশা করাই অন্যায়, বা আশা করলে তা হবে ভুল কিছুর জন্য আশা করা। বহু পরে তিনি একারণেই কি বলবেন 'ফোর কোয়াট্রেটস' কাব্যগ্রন্থে – 'Hope would be hope for the wrong thing'? তারপরও এক সময় মহামারীর শেষ হয়,মৃত্যুর স্রোতের ভেতর থেকে জীবনের হাত জাগতে দেখা যায়, ওয়েস্ট ল্যান্ড কবিতার শেষে হিমালয়ের চূড়ায় জড়ো হয় মেঘদল, শোনা যায় বজ্রপাত–বৃষ্টির শব্দ, আর নতুন জীবনের পদধ্বনি।

১৯১৯ সালে লেখা ইয়েটস্-এর 'দ্য সেকেন্ড কামিং' তার বিখ্যাত কবিতাগুলোর একটি। আদি-খসড়ায় এর নাম রাখা হয়েছিল 'দ্য সেকেন্ড বার্থ'–দ্বিতীয় জন্ম বা পুনর্জন্ম। কবিতাটির সাথে ১৯১৮-১৯ সালের স্পেনিশ ফ্লুর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। কবিতাটি লেখার কয়েক সপ্তাহে আগে ইয়েটস-এর স্ত্রী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মৃত্যুমুখে উপনীত হন। তার স্ত্রী যখন জ্বরে কাঁপছিলেন, তখনই তার মাথায় 'দ্য সেকেন্ড কামিং'-এর আইডিয়াটা আসে। এর বিখ্যাত শুরুর চরণগুলি পাঠকদের কাছে অতি-পরিচিত–জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ' ইয়েটস্-এর এই কবিতার প্রতি গাঢ় অনুরাগ থেকেই নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল:

'Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.'

এলিয়ট বা ইয়েটস-এর কবিতায় মহামারী পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ে দুই মহাযুদ্ধের মাঝের দুই শক্তিশালী সাহিত্য-কর্মে। প্রথমটি হলো, ১৯৩৮ সালে লেখা

বের্টোল্ট ব্রেখট-এর 'লাইফ অফ গ্যালিলিও', আর ১৯৪১ সালে লিখতে শুরু করা আলবেয়ার কাম্যুর 'দ্য প্লেগ' (১৯৪৭ সালে প্রকাশিত) উপন্যাস। 'গ্যালিলিও' ব্রেখটের শ্রেষ্ঠ নাটক, আর 'প্লেগ'-কে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 'সেরা উপন্যাস' হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। দুটো সম্পর্কেই একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই।

গ্যালিলিও নাটকের পটভূমি মোটামুটিভাবে সকলেরই জানা। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমির (১০০-১৭০) সময় থেকে এই বিশ্বাস চলে আসছিল যে পৃথিবীই স্থির হয়ে আছে-মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু আসলে পৃথিবীই--আর সূর্য পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। শুধু টলেমি হলে তাকে বাধা দেওয়া অত শক্ত হত না, কিন্তু এরিস্টটল স্বয়ং এই ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। টলেমির তত্ত্বের পেছনে এরিস্টটলের মতো একজন ক্ষমতাধর 'অথোরিটির' সমর্থন এই তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। চার্চও এই তত্ত্বকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেছিল–রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পরে যখন খ্রীষ্টধর্ম পরাক্রমশালী হয়ে দাঁড়ায় আদি মধ্যযুগে। তাছাড়া, সূর্য যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে–এটা তো প্রতিদিনের নিত্য অভিজ্ঞতার সাথে মেলে। আমরা কি প্রতিদিন এটাই দেখি না যে সূর্য 'ভোরে উঠছে' আর সন্ধ্যেবেলায় 'অস্ত যাচ্ছে'। বহুকাল পরে মার্কস এই সূর্য-প্রদক্ষিণের উদাহরণ টেনে অবশ্য বলবেন যে, যদি 'এপিয়ারেন্স' (প্রতীয়মানতা) আর 'রিয়েলিটি' (বাস্তবতা) একই হত, তাহলে বিজ্ঞানের কোনো দরকারই থাকত না! 'If appearance and reality were the same, the need for science would be superfluous। কিন্তু একথা গ্যালিলিওর সময়ে উচ্চারণ করা সহজ ছিল না। গ্যালিলিও-র সময়কাল বলতে বোঝাচ্ছি, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগ আর সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ (তার জন্ম ১৫৬৫, আর মৃত্যু ১৬৪২ সাল)। ব্রেখটের নাটকের ১ম দৃশ্যের শুরু হয় ১৬০৯ সালে। আর শেষ দৃশ্য জমে উঠেছে ১৬৪২ সালকে ঘিরে। 'গ্যালিলিও গ্যালিলি' তার পুরো নাম। তাকে যদিও আধুনিক পদার্থ বিদ্যার জনক হিসেবে মান্য করা হয়, কিন্তু পদার্থবিদ্যা তো সেভাবে 'শাস্ত্র' হিসেবে তখনো গড়ে ওঠেনি। ব্রেখট তাকে দেখিয়েছেন প্রথমে পাদুয়ার (পরে ফ্লোরেন্সের) বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের একজন অধ্যাপক হিসেবেই। নাটক থেকে আমরা জানতে পারি যে, সপ্তাহে দুটো লেকচার দিতে হয় তাকে–প্রতিটা লেকচার দু'ঘণ্টা করে। এই করে যা পান, তাতে তার সংসার চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (Procurator)-এর অকাট্য পাল্টা যুক্তি, 'আপনার যা খ্যাতি তাতে তো অনেক প্রাইভেট ছাত্র জোটার কথা'। শুনে গ্যালিলিও যা বলেছিলেন তাতে করে বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে এক জায়গায় বড্ড মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

> 'Too many, sir, I teach and I teach and when am I supposed to learn?... I am stupid. I understand absolutely nothing. So I'm compelled to fill the gaps in my knowledge. And when am I supposed to do that? When am I to get on with any research? Sir, my branch of knowledge is still avid to know. The greatest problems still find us with nothing but hypotheses to go on'.

এহেন গ্যালিলিও একদিন দাবী করে বসলেন যে, টলেমির তত্ত্ব সঠিক নয়। দূরবীন ব্যবহার করে এবং অংক কষে তিনি দেখালেন যে আসলে সূর্য নয়, পৃথিবীই তার চারপাশ দিয়ে ঘুরছে। সেইসাথে ঘুরছে আরও কিছু গ্রহ। এটি ছিল আদিতে কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) তত্ত্ব, তাকে সপ্রমাণিত করেছিলেন গ্যালিলিও একশত বছর পরে। এর জন্য পাদুয়া ছাড়তে হল তাকে; কিন্তু ফ্লোরেন্সে গিয়েও

তার তত্ত্ব নিরাপদ আশ্রয় পেল না। এক পর্যায়ে রোমের ভ্যাটিকান চার্চে ডাক পড়ল তার। যখন কিছুতেই তাকে বাগ মানানো যাচ্ছিল না, তখন ভ্যাটিকানের পোপ বললেন, দৈহিক অত্যাচার কী করে করা হয় সেইসব যন্ত্রপাতি ওকে দেখান, তাহলেই সে বুঝতে পারবে। সংলাপটি ঐতিহাসিক:

> 'The Pope: At the very most he can be shown the instruments.
>
> The Inquisitor: That will be enough, your Holiness,Instruments are Mr. Galilei's speciality.'

নাটকের শেষ অংকের আগের অংকে গ্যালিলিও তার শিষ্য অন্দ্রেয়ার সাথে কথা বলছেন। পোপের হুমকির মুখে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেন যে তিনি ভুল ভেবেছেন–টলেমিই সঠিক। বিজ্ঞানকে এভাবে অস্বীকার করে ঠিক করেছিলেন কি গ্যালিলিও? এটাই এই নাটকের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। গ্যালিলিও-র নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা ছাত্ররা তার পিছু-হটার মধ্যে কাপুরুষতা দেখেছিলেন। গ্যালিলিও আত্মসমর্পণ করেছেন ক্ষমতার কাছে–তিনি আপোসকারী, Conformist। ফলে অন্দ্রেয়ার মতো অনেক শিষ্য গ্যালিলিওকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন নজরবন্দী (এমনকি গৃহবন্দীও বলা যায় তাকে); শুধু খাবার-দাবার আর লেখার জন্য কালি-কলম-কাগজ দেওয়া হত তাকে, অবশ্য সেসবও 'সেন্সসরশীপের' মধ্যে দিয়ে যেত। যেমনটা হয়েছিল মুসোলিনির জেলে আবদ্ধ গ্রামসির বেলায়। যেটা কেউই ভাবেনি–তার শত্রুরা তো বটেই, মিত্ররাও ঘুণাক্ষরে কল্পনা করেনি–গ্যালিলিও এরই মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসার রচনা করে ফেলেছেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ– Discorsi বা 'ডিসকোর্সেস'। একটা খেলনা গোলকের ভেতরে এই রচনার পাতাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি এতদিন। অন্দ্রেয়া তার সাথে বহু বছর বাদে দেখা করতে এলে তাকে এর পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে দেন, যাতে সে হল্যান্ডে গিয়ে এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারে। উৎফুল্ল অন্দ্রেয়া বুঝতে পারল কেন গ্যালিলিও সেদিন আরেকজন গিওরদানো ব্রুনো (Bruno) (যাকে কোপেরনিকাসের তত্ত্ব প্রচারের জন্যে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল চার্চের আদেশে) তার মতো হতে চাননি। আপোস করে যে সময় পেয়েছিলেন গ্যালিলিও, সেটি তিনি ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানের কাজে। সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ:

'Andrea:	You gained the leisure to write a scientific work which could be written by nobody else. If you had ended up at the stake in a halo of flames the other side would have won.
Galileo:	They did win…
Andrea:	Why did you recant, then?
Galileo:	I recanted because I was afraid of physical pain.
Andrea:	No!
Galileo:	They showed me the instruments.
Andrea:	So it wasn't, planned?
Galileo:	It was not.'

মনে হয়, গ্যালিলিও নাটকটি লিখে এক ঢিলে তিন পাখী মারতে চেয়েছিলেন ব্রেখট। প্রথমত, বিশ্বাস ও যুক্তির লড়াই যেটা আদি-মধ্যযুগ থেকেই চলছিল– সেই সামন্তবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানভিত্তিক মানবতাবাদকে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখানো। দ্বিতীয়ত, এই নাটকটি যখন লেখা হয়েছিল, তখন মস্কোর শো-ট্রায়ালগুলো শুরু হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য সব স্বীকারোক্তি দিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুবরণ করেছেন লেনিনের পলিটব্যুরোর সহকর্মীরা–জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাদেক, বুখারিন, টমস্কি প্রমুখ। তাদের শুধু instruments দেখানো হয়নি, প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছিল সেদিন। এটি ছিল ব্রেখটের তরফে স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরবর্তীতে পূর্ব জার্মানিতে বসবাস করলেও, স্তালিন সম্পর্কে কোনো মতিভ্রম হয়নি তার ১৯৩৬-৩৮ সালের শো-ট্রায়ালগুলো দেখার পরে। আমার যুক্তির স্বপক্ষে এ-ও বলব যে, পূর্ব ইউরোপের সবগুলো দেশ ব্রেখটের সব নাটকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল গ্যালিলিও নাটকটি। সেটা এমনি এমনি নয়। এর মধ্যে দর্শকরা স্তালিনবাদের সমালোচনা দেখতে পেতেন, যার প্রভাব স্তালিনের মৃত্যুর পরেও চলছিল পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তৃতীয়ত, এই নাটকটির উদ্দেশ্য হল ম্যাকার্থীবাদের হুমকি ও নজরদারীর বিপদ সম্পর্কে দর্শক-পাঠকদের সজাগ করে দেওয়া। জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থী নাট্যকার ও কবি হিসেবে ব্রেখট প্রথমে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, এবং পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। যুদ্ধ চলাকালীন তার প্রতি কড়া নজর রাখত এফবিআই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন পরে যখন 'ঠান্ডা যুদ্ধের' শুরু হল, এবং সিনেটর ম্যাকার্থীর নেতৃত্বে বাম ও কমিউনিস্টদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল, তখন ব্রেখটকেও মার্কিন কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়। আমেরিকার ন্যুয়র্কে প্রায় একই সময়ে ১৯৪৮ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল তার 'গ্যালিলিও' নাটকটি। যে আমেরিকা Freedom of Trade-র কথা বলে বেড়ায় সেখানে Freedom of Research (thought) কোথায়– এটি পরোক্ষভাবে গ্যালিলিও-র বরাত দিয়ে বলেছেন লেখক। ম্যাকার্থী কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানের কিছুদিনের পরেই পূর্ব জার্মানিতে চলে যান ব্রেখট এবং গঠন করেন তার জগৎ-বিখ্যাত 'বার্লিনার এনসেম্বল'(Berliner Ensemble) নাট্যগোষ্ঠী।

মহামারীর কথা বলতে গিয়ে এত সাতকাহন কেন করলাম 'গ্যালিলিও' নাটকের আখ্যানভাগ নিয়ে? কারণ, গ্যালিলিও নাটকের সময়কাল ১৬০৯ থেকে ১৬৪২ অবধি। কয়েক বছর পরপর প্লেগ দেখা দিয়েছে তার স্বদেশভূমি ইতালীতে এই সময়ে। নাটকটির পঞ্চম অঙ্কটি পুরোটা প্লেগকে ঘিরে (ইতালীতে সবচেয়ে বিধ্বংসী প্লেগ হয়েছিল ১৬২৯ সালে; এই নাটকে প্লেগের দৃশ্যটি ১৬১০-১৬১৬ সালের মধ্যকার কোনো একটা সময়ের)। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিত্তবান সবাই--রাজ কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ সকলেই। গ্যালিলিও তার মেয়ে ভার্জিনিয়াকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন, এমনকি তার গৃহকর্মীদেরও তিনি বাসায় রাখেননি। খালি গৃহে তিনি একা থেকে গিয়েছিলেন–তার গবেষণা-কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই অঙ্কটিতে অনেক মানবিক করুণা-শুশ্রুষার মুহূর্ত রয়েছে। মনে হয় ব্রেখট অবিচলিত অনমনীয় গ্যালিলিওকে Stoic-র মতো দৃঢ়তায় আঁকতে চেয়েছেন। কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য তুলে ধরি।

(১) গ্যালিলিও তার দীর্ঘকালের গৃহপরিচারিকা মিসেস Sarti-কে ভৎর্সনা করে বলেছেন কেন তাকে এই মুহূর্তেই ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যেতে হবে:

Mrs. Sarti: But who's going to see you get your meals?

Galileo: You're crazy. Staying in this city in order to cook! *Picking up his notes:*

Don't think I'm a complete fool, Mrs. Sarti. I can't abandon these observations. I have powerful enemies and I must collect proofs for certain hypotheses.

Mrs. Sarti: You don't have to justify yourself. But it's not exactly sensible.'

(২) প্লেগের মধ্যে জনমানবহীন বাসা থেকে পাড়ার ভেতরেই বেরিয়েছেন গ্যালিলিও। উদ্দেশ্য-খাবারের খোঁজ করা। বিশেষত দুধের অভাব, আর এমনিতে খেতে গ্যালিলিও বড় ভালবাসেন। দেখছেন, সামনের রাস্তা দিয়ে দুজন মিশনারী নান যাচ্ছেন।

Galileo: Could you please tell me, sister, where I can buy some milk? The milk women didn't come this morning, and my housekeeper has left.

One Nun: The only shops open are in the lower town.

[এমন সময়ে পাশের বাড়ির জানালা খুলে এক মহিলা গলা বাড়াল।]

Galileo: Have you heard anything about my housekeeper?

Women: Your housekeeper collapsed in the street up there. She must have realized….

[মহিলা এই বলে জানালা বন্ধ করতেই কোথা থেকে দুজন সৈন্য সামনে উপস্থিত হল। তারা তাদের লম্বা বল্লম দিয়ে গ্যালিলিওকে বাধ্য করল আবার ঘরের ভেতরে চলে যেতে। বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিল]

Soldiers: Get right back indoors!

(৩) [সৈন্যরা চলে যেতে আরেকটা ঘরের জানালা খুলে গেল। বেরিয়ে আসল এক বৃদ্ধার মুখ]

Galileo: That must be a fire back there.

Old woman: They've stopped putting them out where there's any risk of infection. All they can think about is the plague.

Galileo: Just like them. It's their whole system of government. Chopping us off like the diseased branch of some barren figtree.

[কোথায় যেন ঘটর ঘটর টিন পেটানোর শব্দ হচ্ছিল]

Galileo: What's that?

Old woman: They're trying to make noises to drive away the clouds with the plague seeds in them.

এ হলো 'খারাপ বায়ু (বা 'Miasma') তত্ত্ব যার মাধ্যমে প্লেগের সংক্রামণ ছড়ায়। সেকালে লোকেরা বিশ্বাস করত আকাশের কিছু কিছু মেঘ 'প্লেগের বীজ' বহন করে দেশে-দেশান্তরে মহামারী ছড়িয়ে দেয়। এর কথা পাঠকদের এর আগেই বলেছি।

গ্যালিলিও নাটকে দীর্ঘ সময় ধরে প্লেগের দৃশ্যাবলী দেখানো হচ্ছিল তার সম্ভাব্য কারণ ছিল বোধকরি এই যে, গবেষণায় ব্রতী বিজ্ঞানী শত মহামারী দুর্যোগ সত্ত্বেও তার গবেষণাগার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে রাজী ছিলেন না এটা তুলে ধরা। জীবনের শেষ ভাগে এসে তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল সত্যানুসন্ধান। নশ্বর দেহের সকল ঝুঁকি নিয়ে তিনি এরই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন প্লেগের মতো ভয়ংকর মহামারীর মধ্যে বসে। কিন্তু, আমার ধারণা, গোটা নাটকের পটভূমি হিসেবে প্লেগের ছায়াকে বেছে নেওয়ার পেছনে ব্রেখটের মনে অন্য উদ্দেশ্যও কাজ করছিল। বাইরের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্লেগের চেয়েও ভয়ংকর ছিল সেকালের অন্ধ অযৌক্তিক কর্ণপাতহীন বিশ্বাস ও সেই অন্ধ বিশ্বাসের নিরংকুশ শাসনের প্লেগ। এই প্লেগের বীজকে সহজে চোখে দেখা যায় না, এই মহামারী মানুষকে জৈবিক অর্থে মারে না। অন্ধ বিশ্বাসের ক্ষমতা তিলে তিলে মারে মানুষকে মানসিক দিক থেকে। 'এ জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ারে' ডানিয়েল ড্যাফো লিখেছেন, লন্ডনের ১৬৬৫ সালের প্লেগের বছরের আগে ও পরে গণক, ওঝা, হাঁতুড়ে ডাক্তার, তুকতাক্ জানা লোকদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত একশো-দেড়শো বছরে একের এক ছোট-বড় আকারের প্লেগ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপের দেশে দেশে। আর সেই সাথে চলেছে 'উইচ হান্ট': চারপাশে শয়তানের ভক্ত ডাকিনী-যোগিনীদের খুঁজে খুঁজে ফাঁসি দেওয়া বা পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে ১৬০৬ সালে ইংল্যান্ডের রাজা হয়েছিলেন জেমস-প্রথম (এর আগে তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা--মেরি স্টুয়ার্টের পুত্র)। এই জেমস-প্রথম একটি বই লিখেছিলেন, যার নাম-*ডেমনোলজি*। স্বয়ং ইংল্যান্ডের রাজা প্লেগের দুর্বিপাকের সময়ে ডাইনী পোড়ানোর আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক মন্দার কারণেই এটা ঘটেছিল, যেমন প্রসার পেয়েছিল ১৯৩০-র দশকে Ku Klux Klan আন্দোলন গ্রেট ডিপ্রেশনের প্রভাবে। ব্রেখট তার নাটকে সেভাবে এদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেননি–শুধু টিনের ড্রাম পিটিয়ে দুষ্ট অশুভ প্লেগের বীজবাহী মেঘকে শহরের বুক থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থার কথা একটি চরিত্রের বরাত দিয়ে আমাদেরকে শুনিয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগের চার্চ স্বয়ং যেভাবে সুযুক্তির চেয়ে মন্দ-যুক্তিকে, প্রায়শ অযৌক্তিককে, প্রশ্রয় দিচ্ছিল–সেটা সমাজ-শরীরকে মহামারীর চেয়ে আরও বেশি বিপন্ন করে তুলেছিল।

এতে চার্চের যতটা ক্ষতি হচ্ছিল, তারচে' বেশি ক্ষতি হচ্ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তার কালের দার্শনিক, গণিতবিদ, তাত্ত্বিকেরা সেই যন্ত্রে চোখ রাখতে চাননি। গ্যালিলিও দু:খ করে বলেছেন যে, তারা এমন ভাব করছে যেন এরিস্টটলের কথাই শেষ কথা! ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, তাদেরকে: 'Gentlemen, to believe in the authority of Aristotle is one thing, tangible facts are another…I offer any observations and everyone laughs: I offer my telescope so they can see for themselves, and everyone quotes Aristotle.' এ-ই হচ্ছে 'ডগমার' প্রভাব যা প্লেগের প্রভাবের চেয়েও সুদূরপ্রসারী–যা কুরে কুরে খায় আমাদের মন ও মননের সজীব প্রবৃত্তিকে। গ্যালিলিওর উক্তি তাই এখনো আমাদের কানে বাজে: 'সত্য ক্ষমতার বৃত্ত থেকে নয়– সময়ের বৃত্ত থেকে জন্ম নেয়' (Truth is born of the times, not of authority)।

এবার আসি আলবেয়ার কাম্যুর 'প্লেগ' উপন্যাসের প্রসঙ্গে। নামেই বোঝা যাচ্ছে লেখাটি মহামারী নিয়ে। ১৯৪১ সালে যখন এই উপন্যাস লেখা শুরু করেন, তখন কাম্যুর বয়স মাত্র ২৮। ১৯৪৭ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়; অবশ্য তার আগেই বেরিয়ে গেছে তার 'মিথ অফ সিসিফাস' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ ও 'আউটসাইডার উপন্যাস'। এই তিনটি লেখাই কাম্যু তার বিশেষ ঘরানার 'অস্তিত্ববাদী' দর্শন প্রকাশ করার জন্য লিখেছিলেন। প্রথম দুটি একই বছরে (১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ২৯ বছর বয়সে। ১৯৭৬ সালে আউটসাইডার নিয়ে – ইমতিয়াজ আহমেদের সাথে যৌথভাবে– একটি দীর্ঘ লেখা লিখি। যার নাম ছিল 'দ্য এসেন্স অফ আলবেয়ার কাম্যু'স্ পেসিমিজম'– তৎকালীন হলিডে পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে তা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে, 'কাম্যুর নৈরাশ্যবাদ এক বিশেষ ধরনের নৈরাশ্য থেকে জন্ম নিয়েছে– যার নাম Solar Pessimism' এবং যার মোদ্দা কথা হচ্ছে– এই পৃথিবীটা সূর্যের ওপরে নির্ভর করে বেঁচে আছে। প্রতিদিন হাজার হাজার তারার জন্ম হচ্ছে, হাজার হাজার তারার মৃত্যু হচ্ছে। সেই অমোঘ নিয়মে সূর্য নামক নক্ষত্রটিরও মৃত্যু একদিন ঘটবেই–এমনই অর্থহীন নশ্বর মানবজীবন। একটা হ্যালির ধুমকেতুর মতো কোনো এস্টরয়েড যদি দৈবাৎ পতিত হয় পৃথিবীতে, তাহলে ডাইনোসররা যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আমরাও সেভাবে অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারি প্রজাতি হিসেবে। এই কথাগুলো যখন লিখি তখন মিথ অফ সিসিফাস পড়া ছিল আমার, কিন্তু প্লেগ তখনো অপঠিত থেকে গিয়েছিল। আজ মনে হয়, প্লেগ পড়া থাকলে কাম্যুর দর্শনবোধকে শুধু 'Solar Pessimism'-র মধ্যে আটকে রেখে দিতে পারতাম না। আমাদের সমসাময়িক কালে কাম্যুর দর্শনবোধকে খান মোহাম্মদ ফারাবী ঠিকই চিনে নিতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এই মৃত্যুচিহ্নিত পৃথিবীতে জীবনের নিকটতম তুলনা শিল্প।' এটা অবশ্য আদিতে নীটশেরই কথা । সুইজারল্যান্ডের বাসেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নীটশে সুরকার ভাগনার (Wagner) ও তার অপেরার ভক্ত হয়ে ওঠেছিলেন। জীবনে পরিত্রাণহীন দুঃখ-যন্ত্রণাই নিত্যসঙ্গী--একে কেবল অতিক্রম করা যায় শিল্প-সংগীত দিয়ে। কাম্যুর ওপরে নীটশের গভীর প্রভাব ছিল।

প্লেগ উপন্যাসে লেখকের ভেতরের কথা তা-ই। আমাদের জীবন মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রায়-সব সময়ই একটি খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। এই খাদ হতে পারে যেকোনো ধরনের দুর্দৈব, দুর্বিপাক বা দুর্যোগ সম্বলিত কোনো ঘটনা; এক অর্থে ঘটনাও নয়–পলকা কোনো সূতোর গ্রন্থি ছিঁড়ে যাওয়া কেবল। এটা হতে পারে আকস্মিক দাঙ্গা, অপ্রত্যাশিত কোনো বৈশ্বিক বা স্থানিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, কোনো অনির্দেশ্য করাল ব্যাধি, কোনো মহামারী, জানা-অজানা স্ট্রেইনের ভাইরাস, কোনো জলোচ্ছ্বাস, কোনো উমপুন, কোনো সর্বগ্রাসী বন্যা, পাহাড় থেকে হঠাৎ নেমে আসা ঢল, প্রবল খরা, আকস্মিক পঙ্গপালের আক্রমণে নেমে আসা খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, কোনো চোরাগুপ্তা ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থানের অপারেশন সার্চলাইট হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাথার ওপরে বিদ্যুতের জীবন্ত তার ছিঁড়ে পড়া, অথবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র মতো গাছের নিচে দাঁড়ানো লোকটির মতো বজ্রপাতে ভস্মীভূত হওয়া, গ্যাসের চুলা বা এসির মোটর ফেটে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড অথবা এক তারা-ঝিলমিল রাতে গাড়ীতে-বাসে ঢুলতে ঢুলতে সড়ক দুর্ঘটনা, ট্রেনের লাইন ভেঙ্গে পড়া, আকাশ থেকে অজ্ঞাত কারণে প্লেন ভেঙ্গে পড়া, অথবা রৌদ্র-ঝলমলে দিনে বিদেশী শহরের স্কোয়ারে বেড়ানোর সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ, অথবা 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মতো হঠাৎ চর জেগে স্টিমারের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। আমরা ভুলে থাকি– হয়ত ভুলেই থাকতে চাই যে সবসময় যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ঘটনা,মারাত্মক অসুখ আমাদের নিত্যসঙ্গী। ছায়ার মতো দুর্বিপাক আমাদের পিছু পিছু হাঁটছে। আমাদের জীবন আসলে পদ্মপাতার জল। কাম্যু সেটাকে

বলেছেন এভাবে– Our lives are fundamentally on the edge of what can be termed as 'the absurd'।

উপরের যে-দুর্বিপাকগুলোর কথা বলা হলো তাতে যে কেউ কোনো দিন ব্যক্তিগত বা সমবেতভাবে 'আক্রান্ত' হব, তা কেউ আমরা বিশ্বাস করি না। এরকম ঘটে থাকে শুনেছি, দেখেছি, বা জেনেছি, তবে কিনা এটা 'আমার জন্যে ঘটা সম্ভব নয়, বা ঘটার সম্ভাবনা এতই কম যাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। সেরকম ঘটনাকেই 'অসম্ভব' (absurd) ধরে নিয়ে আমরা জীবনের পথে চলি। 'প্লেগ' উপন্যাসের গল্প গড়ে উঠেছে আলজেরিয়ার সমুদ্র-উপকূলবর্তী শহর ওরান (Oran)-কে ঘিরে। এর অধিবাসীরা কখনো মনে করেনি তাদের শহরে প্লেগের মহামারীর মতো কোনো দুর্দৈব নেমে আসতে পারে। মহামারী সে তো পুরাকালের গল্পের মতো। প্লেগ তো আর দুনিয়াতে নেই, অন্তত পাশ্চাত্যে নেই। এখন প্লেন চলছে মাথার ওপরে, ফোন এসেছে, ট্রাম চলছে, সংবাদপত্র পাঠ হচ্ছে–নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের মতো প্লেগের মহামারী দেখা দিতে পারে না এই 'আধুনিক' সময়ে? উপন্যাসের এক চরিত্র বলছে, 'যা হচ্ছে তা প্লেগ হওয়া অসম্ভব–কেননা সবাই জানে পাশ্চাত্য থেকে মহামারী অবলুপ্ত হয়ে গেছে কবেই।' তার পর পরই লেখক ন্যারেটরের কণ্ঠস্বরে বলছেন, 'তা অবশ্য ঠিক– কেবল মৃতরাই সে কথা জানত না!' অন্যত্র লেখক বলছেন (এই উপন্যাসে বর্ণনাকারী হিসেবে তাকে ঘন ঘন আসতে হয়েছে):

> 'Pestilence is so common, there have been as many plagues in the world as there have been wars, yet plagues and wars always find people equally unprepared when war breaks out people say: 'It won't last, it's too stupid'. And war is certainly too stupid, but that doesn't prevent it from lasting.' ওরান শহরের লোকেরা মনে করত এই মহামারী একটা দু:স্বপ্নের মতো একদিন কেটে যাবে। তাছাড়া তারা ভাবত, অন্য সব শহরের তুলনায় তারা এমন বেশি গোনাহ্-এর কাজ করেনি যে তাদের ওপরেই ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হতে হবে: 'They continued with business, with making arrangements for travel and holding opinions. Why should they have thought about the plague, which negates the future, negates journeys and debate? They considered themselves free and no one will ever be free as long as there is plague, pestilence and famine.'

ওরান শহরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী ব্যুবনিক প্লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ বই লেখার জন্য কাম্যু প্লেগ-সংক্রান্ত প্রায় সব জরুরি বইই পড়ে ফেলেছিলেন। কালো মৃত্যু, ১৬২৯ সালের ইতালীর প্লেগ, ১৬৬৫ সালের লন্ডন-প্লেগ, ১৯১৮-১৯ শতকের চীনের প্লেগ সম্পর্কে তাকে পড়তে হয়েছিল। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা রয়েছে যে, নাজী-অধিকৃত প্যারিস/ফ্রান্সকে কাম্যু একটি প্লেগ-কবলিত অবস্থা হিসেবে দেখেছিলেন। ফরাসী মুক্তিযুদ্ধের পত্রিকা 'কমবেট'-এর সম্পাদক হিসেবে– Ressistance Fighter হিসেবে--তিনি 'প্লেগ' এর মতো উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণেই। পুতুল Vichy-সরকার তখন ফ্রান্সে ক্ষমতায়, যার পেছনে কাঠখড়ি নাড়ছে নাজী জার্মানি। এরকম অবস্থায় একদল ফরাসী প্রায় উদ্যমই হারিয়ে বসে নাজীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কাম্যুর মতো তরুণ যুবশক্তি তবু মাথা নত করেনি। এই উপন্যাসের মূল নায়ক ডাক্তার রুয়ো (Rieux) প্লেগের মহামারী দেখে পিছু-পা হননি। মহামারীকে বিধাতার অভিশাপ হিসেবে

দেখেননি তিনি। এর মধ্যে দিয়ে কোনো 'নিখিল অভিপ্রায়' ব্যক্ত হয়েছে–সেটা তিনি মনে করেননি। আজ করোনারকালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি–যার-তার করোনার হচ্ছে। যেকোনো লোকই এতে মারা যেতে পারে– এর মধ্যে কোনো 'ডিজাইন' নেই, কোনো বাছবিচার নেই, 'Suffering is randomly distributed'। এর মধ্যে কোনো নীতি-নৈতিকতার উপাদান নেই, এর প্রাদুর্ভাব যেকোনো ভাবেই ঘটছে–It is simply absurd and that is the kindest thing one can say of it. ডাক্তার তারপরও কাজ করে গেছেন: দিন নেই, রাত্রি নেই পরিশ্রম করেছেন আর্তের সেবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের বাসবদত্তাকে মনে আছে? ডাক্তার রুয়ো কোনো সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মতো পূণ্যবান লোক নন। মারীগুটিকায় ভরে যাওয়া বাসবদত্তার কাছে তিনি কোনো পূণ্যাত্মা হয়ে দাঁড়াননি। তিনি একাজ করেছেন নিছকই 'ঔচিত্যবোধে', তার সুরুচি তাকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকতে বাধ্য করেছে। কোনো জরা-ক্লিষ্ট রোগীকে ফেলে যাওয়া শোভন নয়। এই একান্ত শোভনীয়তা-বোধ (যাকে আমি ঔচিত্যবোধ বলেছি) ডাক্তারকে চালিত করেছে। বইয়ের একটি কেন্দ্রীয় অংশে ন্যারেটর লিখছেন: 'This whole thing is not about heroism. It's about decency. It may seem a ridiculous idea, but the only way to fight the plague is with decency.' আমি এ-ও মনে করি–এই decency নিছক আনুষ্ঠানিক বিধিমালা নির্দিষ্ট দায়িত্ববোধ বা হিপোক্রিট শপথের মধ্যে ব্যক্ত Responsibility-র থেকে কিছুটা ভিন্ন একটি বিষয়। ২০২০ সালে লকডাউনের শুরুতেই ইউনাইটেড হসপিটালে সম্প্রতি আইসোলেশন বেডে ৫ জন করোনা রোগী অগ্নিকাণ্ডে মারা গেলেন। তখন সেখানে তাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য কোনো ডাক্তার বা নার্স ছিল না। এটা বিধিসম্মত দায়িত্ববোধের অভাব নাকি করোনা রোগী চিকিৎসার বিষয়ে প্রবল অনীহা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ১৬-১৭ বছরের যে-তরুণ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, তারও মনে ভয় ছিল মারা যাওয়ার। মৃত্যুভয় কার না থাকে? কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে তার মন সায় দেয়নি (আমার বড় ভাই এমন একটি উদাহরণ ছিলেন)। এরকম অনেক উদাহরণ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি। কেন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেনি, তার সম্যক কারণ অজ্ঞাত। কোনো জাতীয়তাবাদ বা আবেগ-উদ্বেলিত দেশপ্রেম নয়, হয়ত কাম্যুর কথিত decency বা উচিত্যবোধ তাদের সেদিন চালিত করে থাকবে। ওরান শহরের প্লেগ বা আমাদের করোনাকালের ডা: রুয়োর মত অসংখ্য যোদ্ধাদের মাথাতেও হয়ত সেরকম কোনো বোধ আজ কাজ করছে।

মহামারীর আরও অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে আধুনিক ইংরেজি, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে। জোসেফ কনরাডের নানা উপন্যাসে, কাফকার দর্শনে-রচনায়,গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা' এবং 'হানেড্রড ইয়ার্স অফ সলিচ্যুড', সারামাগোর 'ব্লাইন্ডনেস' উপাখ্যানে বড়ভাবে এসেছে জানা ও অজানা মহামারীর অশুভ ছায়া। নাট্যকার চেখভ মারা গিয়েছিলেন যক্ষা মহামারীতে; কবি গিয়ম আপলেনিয়র, চিত্রকর গুস্তাভ ক্লিমট্ ও সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার মারা যান স্পেনিশ ফ্লুতে; এক্সপ্রেশোনিস্ট ইগন শিয়েল তিনিও মারা যান একই কারণে। চিত্রকর মুনচ (Edvard Munch)-এর Self-Portrait with the Spanish Flu, Self-Portrait after the Spanish Flu ও আরও কিছু চিত্রকর্ম ১৯১৮ সালের স্পেনিশ ফ্লু মহামারীর প্রভাবেই তৈরি হয়েছিল। মহামারীর অসুখ দীর্ঘ ছায়া ফেলে ভার্জিনিয়া ওলফের জীবনে, বিশেষত তার প্রবন্ধে যার নাম অন বিইং ইল। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'গণশত্রু' (ইবসেনের 'এনিমি অফ দ্য পিপল'-এর রূপান্তর) কলেরা মহামারীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। অন্ধ বিশ্বাস, প্রচলিত ক্ষমতা, বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা

এবং জনগণের প্রতিরোধ সব তর্কই চলে এসেছে তার ছবিতে। এসব রচনাই বিশদ পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে, যা আপাতত মূলতবি রইল।

৯। শেষের কথা

ইতিহাস থেকে বড় শিক্ষা সম্ভবত এই যে, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। কোভিডের আগেও অতিমারী এসেছিল প্লেগ বা স্পেনীশ ফ্লুর মতো। কলেরা-জলবসন্তের মতো মহামারী তো ছিল একসময় আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ফি-বছরের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সেসবের প্রেক্ষিতে আমাদের উন্নয়ন চিন্তায় জনস্বাস্থ্য একটি বড় ধরনের কোনো প্যারাডাইমের জন্ম দিতে পারেনি। এরকম দুর্বিপাকের সামনে পড়লে আমরা নতুন করে জনস্বাস্থ্যকে কিছুদিনের জন্যে হলেও Common Goods-র অংশ হিসেবে চিন্তা করতে থাকি। তখন আমাদের মনে হয় সবার জন্য ন্যূনতম জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দরকার, এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। জনস্বাস্থ্যের জন্য মাঠ-পর্যায়ে প্রশিক্ষিত জনবল বাড়ানো দরকার, যথেষ্ট মাত্রায় জরুরি স্বাস্থ্য অবকাঠামো রাজধানী শহরে, মফস্বলে ও গ্রামে গড়ে তোলা দরকার। মহামারীর সময়ে স্বাস্থ্যবিধি নিষ্ঠার সাথে পালন করা দরকার। কিন্তু এই কথাগুলো মহামারীর প্রকোপ কিছুটা কমে এলে আবার আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। এই সাময়িক স্মৃতির পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে । তার একটি কারণ এখানে নির্দেশ করি। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণের অবহেলার পেছনে কাজ করছে রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক আমলের স্মৃতি, যেখানে এলিটদের জন্য একধরনের এনক্লেভ ধরনের 'আধুনিক' স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আর নিম্নবর্গের জন্য 'ট্র্যাডিশনাল' স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি আমাদের ওপরে প্রভুত্ব করেছিল, তারা কখনোই আমাদের সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দাবীকে স্বীকার করেনি, যেমন করেনি সার্বজনীন গণতন্ত্রের দাবী।

দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে 'আধুনিক' স্বাস্থ্যব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল মূলত সেনাবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য; সাধারণ জনগণ কীকরে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা পাবে এই প্রশ্নটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় একপ্রকার অদৃষ্টেরই কাছে। এভাবেই সাধারণ জনগণকে রাজশক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন এক 'দ্বৈত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা' গড়ে তোলা হয়, যা ছিল কৃষক সমাজ থেকে রাষ্ট্রশক্তির গভীর বিচ্ছিন্নতারই বহিঃপ্রকাশ। কৃষক-বিদ্রোহকে রাষ্ট্রশক্তি সবসময় তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছে, আবার কৃষক সমাজও রাষ্ট্রশক্তির কথায় সহজে আস্থা রাখেনি- একরূপ সন্দেহের চোখেই দেখেছে। প্লেগের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা এই এনক্লেভ ধরনের দ্বৈত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মডেলকে যৌক্তিকভাবে সাজাতে পেরেছিল। কেননা, প্লেগ হলে এর একমাত্র প্রতিষেধক ছিল প্লেগের রোগীকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আইসোলেশন বা কোয়রেন্টাইনে রাখা।

জনস্বাস্থ্যের এই 'কোয়ারেন্টাইন মডেল' প্লেগের জন্য কার্যকর ছিল, কিন্তু কলেরা প্রভৃতি মহামারীর বেলায় এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ইউরোপে ১৮২০ থেকে শুরু হয়ে উপর্যুপরি সংঘটিত কলেরা মহামারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক নতুন ধরনের জনস্বাস্থ্য মডেলের। শিল্পায়নের প্রথম যুগে শ্রমিক-বসতিগুলোর অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে সেখানে বাসস্থানের পরিবেশ, পয়ঃনিষ্কাশন, সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ, শীতের মৌসুমে 'হিটিং সিষ্টেমের' অনুপস্থিতি এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান করা ছাড়া মহামারী-অতিমারীর সমস্যা দূরীভূত করা যেত না। একটি শৃঙ্খলাপরায়ন শ্রমশক্তি

সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল Bio-power এর। এরই ফলস্বরূপ উনিশ শতকে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে লন্ডন শহরে 'আন্ডারগ্রাউন্ড স্যুয়ারেজ সিস্টেমের' নির্মাণ এবং ১৮৭১ সালের পারী কমিউনের বিদ্রোহের পর জার্মানীতে বিসমার্কের নেতৃত্বে 'Social State'র অভ্যুদয়। সেইসাথে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আমরা লক্ষ করি সাধারণ জনগণের জন্য ক্রমশ কিছু কিছু গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি। মহামারীর চরিত্র বদল, শ্রমিকদের আন্দোলন, এবং সামাজিক গণতন্ত্রী ধারার জনপ্রিয়তা এসবের ফলে ইউরোপে Bio-power-এর ক্ষমতা প্রযুক্তিগতভাবে আরও বেড়ে যায়।

মহামারীর হাত ধরে শুধু ওয়েলফেয়ার স্টেট ও গণতান্ত্রিক অধিকারই ইউরোপে জন্ম নিতে শুরু করেনি, এর মধ্য দিয়ে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতারও উদ্বোধন দেখি। ম্যালেরিয়ার ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগে উপনিবেশে স্থায়ীভাবে শাসন করা ছিল একটি ঝুঁকিপূর্ণ ধারণা । ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পরে এই শাসনকার্য পরিচালনা বিদেশী উপনিবেশিক সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীর পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে। শুরু হয় বিশ্বকে যার যার উপনিবেশে ভাগ করা নিয়ে ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তারই পরিণতি প্রথম মহাযুদ্ধ। অর্থাৎ উপনিবেশের জনগণ সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিসমার্কের সোশ্যাল স্টেট-র মতো কল্যাণকামী পুজিঁবাদের কোনো প্রতিশ্রুতি পায়নি। বরং ভ্যাকসিন-সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের চৌহদ্দী আরও বেশি সংকুচিত হয়ে পড়ে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে। এইভাবে মহামারী আর কেবল রোগ-বালাইয়ের তত্ত্বে আবদ্ধ না থেকে যুক্ত হয়ে পড়ে বৃহত্তর ঔপনিবেশিক শাসন বলয়ের সার্কিটে।

তবে মহামারীর ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সৃষ্টিশীলতারও জন্ম হতে দেখি আমরা। আধুনিক ইঙ্গ-মার্কিন সাহিত্যে এলিয়ট-ইয়েটস প্রমুখ কবিদের আবির্ভাব হয় স্পেনীশ ফ্লু আক্রান্ত ইউরোপেই। টমাস মান বা আলবেয়ার কাম্যু-র উপন্যাসে সরাসরিভাবে চলে আসে রোগ-ব্যাধি বা মহামারীর প্রসঙ্গ। সামষ্টিক বিপর্যয় রোধে ব্যক্তির ভূমিকা বড় আকারে দেখা দেয় জ্যঁ পল সাত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে। ব্রেখটের 'গ্যালিলিও' নাটকে ফিরে আসে সপ্তদশ শতকের মহামারী-অতিমারী প্লেগ একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে। এই মহামারী ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকেই আঘাত করতে সক্ষম, এবং এই অর্থে, এটি সামন্তবাদ বিরোধী এবং 'গণতান্ত্রিক' চরিত্রসম্পন্ন। এই বোধ আধুনিক সাহিত্যের। পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্যের উত্থানের পেছনে যে মন ও মনন ক্রিয়াশীল ছিল, তা কাজ করেছে বাংলা সাহিত্যের উত্থানের পেছনেও। জাত-পাতবিরোধী শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজের রমেশ, বা রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের জগমোহন-যিনি অন্ত্যজ শ্রেণির নি:সহায় লোকদের জন্য নিজ গৃহে হাসপাতাল খুলে প্লেগের ছোবলে মারা গিয়েছিলেন-এসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার উদ্বোধন হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে সেযুগের সাহিত্যে; রচনাকারেরা এর প্রতিকার খুঁজেছেন সামাজিক আত্মশক্তির মধ্যে- সেটা সত্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এই ধারা চলেছে হুমায়ুন আহমেদের 'মধ্যাহ্ন' পর্যন্ত। মহামারী শুধু কেড়েই নেয়নি, প্রকারান্তরে এক আধুনিক নাগরিক বোধের জন্ম দিয়েছে গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায়। 'কল্লোল' যুগের কবি-সাহিত্যিকেরা এই বোধ থেকেই নিষ্ক্রান্ত।

এখন দেখার বিষয় যে, আজকের অতিমারী আমাদের স্বাস্থ্যভাবনায় নতুন কোনো বোধের সঞ্চার করে কিনা? এখন আমরা আগের চেয়ে অনেক দম নিয়ে বলতে পারছি যে অন্তত জিডিপির ২.৫ থেকে

৩ শতাংশ জনস্বাস্থ্য খাত বাবদ ব্যয় হওয়া দরকার (প্রকৃত প্রস্তাবে যা কোভিডের আগের বছরেও ছিল জিডিপির মাত্র ০.৫ শতাংশ)। কিন্তু শুধু সামগ্রিক ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। কোভিড যেমন করে মাঝে মাঝেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় 'ঢেউয়ের' রূপ নিচ্ছে, তাতে করে জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সার্বজনীন সুরক্ষার বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া দরকার। যে কোনো সময় যে কেউই এর শিকার হতে পারেন, এবং কাজ বা আয়ের সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন। একটা পুরো পরিবার কোভিডের কারণে পথে বসে যেতে পারে। যারা অসচ্ছল ইতোমধ্যেই, তাদের জন্য কোভিড ঝুঁকি আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশে ধনী-গরিবের মধ্যকার আয়-বৈষম্য এমনিতেই প্রকট, এখন কোভিডের কারণে সঞ্চয় নি:শেষিত হওয়ার কারণে এই বৈষম্য সম্ভবত আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে।

ভবিষ্যতই বলবে যে, করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ ইতিহাসের কোন ধারাকে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করবে। আমাদের দেশে করোনার সঙ্কট কি বড় ধরনের সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হবে--যেমন এটা ঘটেছিল ১৯১৮-১৯ সালের স্পেনিশ ফ্লু-এর সময়ে রাশিয়ায় ও ইউরোপে? নাকি এখানে নেমে আসবে অরাজক পরিস্থিতি ও চরমপন্থার রাজনীতি, অথবা এর বিপরীতে আসবে কোনো স্বৈরতন্ত্রের উত্থান? করোনা-উত্তর বিশ্বের অংশ হিসেবে আমরা কি মননে-সমাজে-রাষ্ট্রচিন্তায় বিজ্ঞান দ্বারা চালিত হব, নাকি অন্ধ বিশ্বাসের নিয়তিবাদে আস্থা রেখে আরও একটি প্রলয়ের দিকে এগিয়ে যাব? আমাদের নৈতিকতায় কি আরও স্খলন হবে, নাকি আমরা সহমর্মী যুথবদ্ধতায় আরও সাহসী হয়ে উঠব– আগামী দিনের যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায়? আমরা কি অবাধ তথ্য-প্রবাহকে উৎসাহিত করব যাতে করে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও দক্ষ ও মানবিক হতে পারে? নাকি, আমরা ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন করে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে চলব? ব্যক্তিজীবনে আমরা কি করোনার আগে যেমন, তেমনই আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরমাণু-সদৃশ জীবনযাপন করে চলব, নাকি হব সামাজিক দায়িত্ব পালনে যত্নশীল এবং 'অপরের' অভাব ও সমস্যার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ? আমরা আসলেই একটা ইতিহাসের মধ্যে আছি।

গ্রন্থপঞ্জি

Basu, Shankari Prasad (Ed.) (1982), *Letters of Sister Nivedita*, Vol. 1.

Bell, W. G. (2001), *The Great Plague in London* (edited by B. Hollyen), The Folio Society, London, 256p.

Brecht, B. (2008), "Life of Galileo," *Collected Plays*, Volume 5, Methuen Drama, A & C Black Publishers Ltd, London, pp. 1-106.

Brown, C., and M. Ravallion (2020), *Poverty, Inequality, and Covid-19 in the US*, Vox-EU/ CEPR (accessed online).

Chatterjee, P. (1993), *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, University of Minnesota Press, Minncapolis.

Chen, J. T. and N. Krieger (2020), *Revealing the Unequal Burden of Covid-19 by Income, Race/ Ethnicity, and Household Crowding: US County vs Zip Code Analyses*, Harvard Center for Population and Development Studies Working Paper, Vol. 19, No. 1.

Foucault, M. (1980), *Power/ Knowledge: Selected Writings 1972-1977* (edited by C. Gordon), The Harvester Press, New York.

Foucault, M. (1990), *The History of Sexuality: An Introduction*, Random House, , New York.

Sandel, M. J. (2009), *Justice: What's the Right Thing to Do?* Farrar, Strauss and Giroux, New York.

Sen, A. (2009), *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambrirdge, Massachusetts.

Thompson, Edward J. (1979), *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist*, Riddi, Calcutta.

Thompson, E. P. (1993), *Alien Homage: Edward Thompson and Rabindranath Tagore*, Oxford University Press, Delhi.

Ziegler, P. (1997), *The Black Death*, The Folio Society, London, 280p.

দীপেশ চক্রবর্তী (২০১১), "শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: উপনিবেশিক *ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি*," *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, অনিক পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫১-৭৮।

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত (২০০৮), নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ: এক *বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন*, গাঙচিল, কলকাতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (২০১০ক), " পারিবারিক প্রসংগ," *প্রবন্ধ সমগ্র*, চর্যাপদ, কলকাতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (২০১০খ), " সামাজিক প্রবন্ধ," *প্রবন্ধ সমগ্র*, চর্যাপদ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৫), *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চতুরঙ্গ", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৫), জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছিন্নপত্র", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, কলকাতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায় (১৪০৪ বঙ্গাব্দ), "পল্লী সমাজ", শরৎসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, (সম্পাদকঃ সুকুমার সেন), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায় (১৪০৪ বঙ্গাব্দ), "শ্রীকান্ত", শরৎসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, (সম্পাদকঃ সুকুমার সেন), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।